২৬৫

সাপ্তাহিক বুলেটিন

আষাঢ় ১৪২৩
জুন ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৬৫ আষাঢ় ১৪২৩ জুন ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সূ চি প ত্র

০৩ **আকতার হোসেন**
বরেন্দ্র এলাকা পানি দূর্যোগের শিকার-বরেন্দ্র বাঁচাতে চাই বাস্তবসম্মত পলিসি

০৯ **শফি আহমেদ**
নজরুল রচনার যেদিকটায় তেমন আলো পড়েনি

১৩ **ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান**
জাতীয় শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এখনো পর্যাপ্ত নয়

১৫ **মো. ইয়াসিন আরাফাত ও মো. সাজ্জাদ হোসন খান**
সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

১৯ **মোঃ মাহমুদ হাসান রাসেল**
জীবনের দাবী:সর্বক্ষেত্রে স্থিতিশীল সহায়ক পরিবেশ ও সবুজ পৃথিবী

২৩ **তৌফিক আহমেদ**
সুকুমার চিত্ত বিকাশে লোক সংস্কৃতি ও গণনাটক

২৫ **মোস্তফা মল্লিক**
শিক্ষায় দরিদ্র নয় বাংলাদেশ

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

আ ক তা র হো সে ন

বরেন্দ্র এলাকায় পানি দুর্যোগ: সমাধানে বাস্তবসম্মত নীতি

পানির সঙ্গে জীবনের অস্তিত্বের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সূর্যের আলোয় পানির বাষ্পীভবন এবং পুনরায় ঘনীভবনের মাধ্যমে বৃষ্টি আকারে প্রত্যাবর্তন– এই পানিচক্রের মাধ্যমে গঠিত পরিবেশের অভিযোজিত ফলই হচ্ছে জীবজগৎ।

সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৭০% পানি কিন্তু এর ৯৭.৫% মহাসাগরের লবণাক্ত পানি।

মাত্র ২.৫% মিঠা/স্বাদু পানি যা পানযোগ্য। এর মধ্যে ১.৭২ ভাগ হিমবাহ, তুষার আর মেরুর জমাটবাঁধা বরফ। ০.০৭৫ ভাগ মাটির নিচে জমা পানি আর অবশিষ্ট ০.০২৫ ভাগ হ্রদ, নদ-নদী, বিল-ঝিল আর পুকুরসহ অন্যান্য জলাশয়ের পানি। অর্থাৎ মোট পানির মাত্র ১% মিঠা পানি যার ০.৩% হলো নবায়নযোগ্য। পৃথিবীর প্রায় ১২০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।

সারা বিশ্বের সব ধরনের ও রোগের প্রায় ৮০ ভাগই কোন না কোনভাবে পানির সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতি বছর ১৪ লক্ষ শিশু দূষিত পানি ও নাজুক পয়ঃব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত রোগে মারা যায়। ধনী দেশগুলোর শিশুরা উন্নয়নশীল দেশের শিশুর চেয়ে ৩০ থেকে ৫০ গুণ বেশী বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করে। আমাদের দেশে পানির প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে বৃষ্টিপাত, পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল ও ভূ-গর্ভ।

পানির প্রয়োজন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। পানি পান ছাড়া মানুষ তিন দিনের বেশী বাঁচে না। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার যেমন– গোসল, ধোয়া-মোছা, পশুপালন, মৎস্য চাষ, কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, নগরায়ন কোন কিছুই পানি ছাড়া সম্ভব নয়। এক কথায় পানি ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব নেই, পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব নেই।

পানির চাহিদা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। অথচ সংকুচিত হচ্ছে পানির উৎস এবং পানিপ্রবাহ। সমস্যার মূল এখানেই। প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট, বেড়িবাঁধ তৈরী, রাস্তা তৈরী, নগরায়ন সবকিছুই চলছে অপরিকল্পিতভাবে অথবা অসাধু লোকদের বিশেষ উদ্দেশ্যে। নদীর প্রবাহ কমে যাবার ফলে নদীর তলদেশে পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে মার্চ-মে সময়ে যখন পানির চাহিদা সর্বোচ্চ তখন পানি প্রবাহ সবচেয়ে কম। আবার জুলাই-সেপ্টেম্বর যখন পানির চাহিদা সবচেয়ে কম তখন পানির যোগান থাকে সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ যোগান থাকলেই চাহিদা সবসময় পূরণ হয়–এটা সবসময় ঠিক নয়। প্রশ্নটি হচ্ছে ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ।

বাংলাদেশে মিষ্টি পানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রবাহমান নদী ও বৃষ্টিপাত। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৬৬৬ মি.মি. (২০১১): সিলেট অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৫,৮০০ মি.মি. এবং সর্বনিম্ন

বরেন্দ্র এলাকায় ১,৪০০ মি.মি.। শুষ্ক মৌসুমে মোট পানি চাহিদার ৮৫% সরবরাহ করে দেশের প্রধান তিনটি নদী (পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা)। মোট পানি চাহিদার ৪৭% পানি আসে প্রধান নদীসমূহ থেকে, অবশিষ্টাংশ আসে অন্যান্য নদী এবং জলাশয় থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭০০টি ছোট বড় নদী রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ২৪,১৪০ কি.মি.। অধিকাংশই শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায়। ৬৫টি নদী মারা গেছে এবং ১৭৫টি মৃতপ্রায়। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার প্রধান নদী হচ্ছে– পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই, গোরাই, যমুনা, বড়াল, শিব, ফকিন্নি, পুণর্ভবা, তুলসীগঙ্গা, মুসাখান, নন্দকুজা, গুমানি, বারালাই ও নারদ। সবগুলোই শুষ্ক মৌসুমে গড়ে প্রায় ৯০% শুকিয়ে যায়। ফলে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি, মৎস্য, নৌ চলাচল, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী। সর্বোপরি, পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রায় দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটছে।

গঙ্গা নদী প্রায় ২০ লক্ষ বছর যাবৎ বহমান। গঙ্গা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী প্রবাহ। প্রায় ৪৫ কোটি মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনধারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই গঙ্গাপ্রবাহের নির্ভরশীল। গঙ্গার অংশ ভারতের ৭৯%, নেপালের ১৪%, চীনের ৩% এবং বাংলাদেশের ৪% (যা বাংলাদেশের ৩২% এর সমান)। বাংলাদেশের ৮৬ ভাগ এলাকা ৩টি বৃহৎ নদী প্রবাহের আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশে প্রবহমান নদীসমূহের মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী যার মধ্যে ৫৪টি ভারত সীমান্ত পার হয়ে এবং ৩টি এসেছে মিয়ানমার থেকে। নদীগুলোর উৎস হিমালয় থেকে এবং বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে চীন, ভারত, নেপাল, ভুটান ও সিকিম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ ভাটির দেশ। কাজেই উজানের কারো যদি অতিরিক্ত পানি তৃষ্ণা থাকে তাহলে তা ভাটির দেশের মরু পিপাসার কারণ হ'তে পারে– এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। ফারাক্কা ভারতের পানি তৃষ্ণার সূচনা। ১৯৭৫ এর এপ্রিলে ভারত বাংলাদেশকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ভারত পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা চালু করবে ২১এপ্রিল থেকে ৩১মে ৪১দিন সময়ে মাত্র ১১ হাজার থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করবে এবং বাংলাদেশের জন্য ৩৯ হাজার থেকে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি ছেড়ে দেবে। স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ৫৫ হাজার কিউসেক থেকে যদি পানিপ্রবাহ ১০ হাজার কিউসেক বৃদ্ধি পায় তাহলে অতিরিক্ত পানি বাংলাদেশ পাবে। একইভাবে ১৯৫২ সালে ভারত পাকিস্তান সরকারকে বুঝিয়েছিল যে কেবলমাত্র হুগলি নদীর নাব্যতা রক্ষার মাধ্যমে কলকাতা বন্দরকে চালু রাখাই ফারাক্কার লক্ষ্য। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট তখন বিষয়টি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রাখার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ভারত তাতে সম্মত হয়নি।

এরপরই শুরু হলো প্রতিকূল প্রভাব। ১৯৭৫ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে সর্ব নিম্ন পানি প্রবাহ দাঁড়ালো ২৩,২০০ কিউসেক। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশ বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার পরামর্শ দেয় এবং দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের ১৮ই এপ্রিল উভয় দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা হয় যে, এপ্রিলের শেষ ১০ দিন বাংলাদেশ পাবে ৩৪,৫০০ এবং ভারত পাবে ২০,৫০০ কিউসেক। শেষে ০৫ নভেম্বর ১৯৭৭-১৯৮২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য 'গ্যারান্টি কজ'সহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পূর্বের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে।

এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ হলো শুষ্ক মৌসুমে পানি ঘাটতি দেখা দিলে ৮০% পানি পাবে বাংলাদেশ। এরপর শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ নেপালে পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রস্তাব দেয় আর ভারত গঙ্গায় পানি প্রবাহ বাড়ানোর জন্য গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খালের প্রস্তাব দেয়। পরে বাংলাদেশ ও ভারত নীতিগতভাবে নেপালে যৌথভাবে জলাধার নির্মাণের জন্য একমত হয়। কিন্তু কিছু পরে ভারত এ প্রস্তাব থেকে সরে আসে এবং বাংলাদেশকে আড়াল রেখে নেপালের সঙ্গে জলাধার নির্মাণ ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চুক্তি করে। ১৯৮২ সালে ১৯৭৭ সালের চুক্তিটি "সমঝোতা স্মারক" নামে দু'বছরের জন্য নবায়ন করে। এসময় 'গ্যারান্টি কজ' বাদ দেয়া হয়। ১৯৮৯ এর পর দীর্ঘদিন ধরে আর কোন পানি বন্টন চুক্তি হয়নি। ফলে ১৯৯৩ সালের ৬ এপ্রিল পানি প্রবাহ ছিল মাত্র ৯,৪৩৭ কিউসেক। কাজেই গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্পের সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়নি। সেচ পাম্পগুলো সচল রাখার জন্য প্রয়োজন পদ্মায় ন্যূনতম গভীরতা ৪.৭৩ মিটার। কিন্তু ১৯৯৩ সালে পানির গভীরতা ছিল মাত্র ৪.৫ মিটার।

বর্তমানে আমরা অতিক্রম করছি ৩০বছর মেয়াদি পানি চুক্তির পর্ব। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী যদি গঙ্গার পানিপ্রবাহ ৭০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার কিউসেক থাকে, তাহলে বাংলাদেশ পাবে ৩৫ হাজার কিউসেক। যদি ৭৫ হাজারের বেশী প্রবাহ থাকে তাহলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক। যদি প্রবাহ ৫০ হাজারের বেশী না হয় তাহলে ভারত ৯০% পানি ছাড়বে। এ চুক্তিতে কোন 'গ্যারান্টি কজ' নেই। আর গ্যারান্টি কজ না থাকার কারণে পানির ন্যায্য হিস্যা না পেলে আন্তর্জাতিক আদালতে যাবার অধিকারও বাংলাদেশ হারিয়েছে। তারপরও চুক্তি হয়েছে মাত্র একটি নদীর প্রবাহ নিয়ে।

ভারতের অন্য মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১২ বছরের মধ্যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প সম্পন্ন করতে একটি নির্দেশনা দিয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত ৩৬টি নদীতে ৩১টি সংযোগ সম্পন্ন

করেছে। এছাড়া উজানে ভারত বিভিন্ন নদীতে যে সমস্ত বাঁধ তৈরী করেছে তার সংখ্যা প্রায় ৫৫০। ভারত ফারাক্কার উজানে উত্তর প্রদেশের কানপুরে আরো একটি বাঁধ নির্মাণ করে একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে বিহারের বিরাট ভূ-ভাগে, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের শত শত মাইল মরুভূমিতে, চেন্নাই ও দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্য পর্যন্ত জল সেচের ব্যবস্থা করেছে। ফারাক্কা পয়েন্টে যেন প্রয়োজনীয় পানি পৌঁছাতে না পারে সেজন্য ভারত অন্যতম প্রদায়ক নদী ভাগীরথীর বিভিন্ন পয়েন্টে ড্যাম ও ব্যারেজ নির্মাণ করেছে। তার মধ্যে তেহরী বাঁধ অন্যতম।

ভাগীরথী নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তরখন্ড রাজ্যে অন্যতম প্রধান নদী হিসাবে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গঙ্গার অন্যতম পানিপ্রবাহের উৎসে পরিণত হয়েছে। একইভাবে গঙ্গার আরেকটি উৎস রামগঙ্গা নদীতে একটি বৃহৎ ও বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নিম্ন গঙ্গা প্রকল্প হতে ৬ হাজার কি.মি. খালের মাধ্যমে ভারত গঙ্গার পানি সরিয়ে নিচ্ছে। এছাড়াও তেঁতুলিয়া সীমান্তের বাংলাবান্ধার জিরো পয়েন্টের উত্তর-পশ্চিম কোণে মহানন্দা নদীর উপর ফুলবাড়ী ব্যারেজ নামে খ্যাত এক বিশাল বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত। মহানন্দা মালদহ হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং গোদাগাড়ীতে পদ্মার সাথে মিলিত হয়। মহানন্দার ৩৭টি শাখা নদী সিক্ত হয়ে এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা শষ্যে পরিপূর্ণ উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

মহানন্দার স্বাভাবিক প্রবাহ বিপর্যস্ত করার ফলে শাখা নদীগুলি মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। এসব নদীর মধ্যে আছে চাওয়াই, তালমা, পাঙ্গা, কুডুম, পামাপ, ভেরসা, ডাহুক, তীরনই, রণচন্ডি, বেরং, জোড়াপানি, ঘোড়ামারা, নাগর, সিঙ্গিয়া, বুড়িতিস্তা প্রভৃতি। যার ফলে পানির স্তর বহু নিচে নেমে গেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। নদীতে চর জেগেছে। নদীতে পানি নেই, মাছও নেই। কৃষিতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলার গজাবডোবায় আরো একটি বহুমুখী ব্যারেজ নির্মাণ করে ভারত বাংলাদেশের বৃহত্তম তিস্তা ব্যারেজের কফিনে মারাত্মক এবং সম্ভবত শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। এটি তিস্তা ব্যারেজ থেকে ৭০ কি.মি. উজানে অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০০৪ সালে উদ্বোধন করেন। তখন বাংলদেশ সরকারের প্রতিবাদের কারণে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। পরে ২০০৯ সালে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। প্রথম থেকেই বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে বিশেষত বাম প্রগতিশীলদের উদ্যোগে। টিপাইমুখ বাঁধ ছাড়াও ভারত তার মেগা প্রকল্পের অংশ হিসাবে ব্রহ্মপুত্র নদকে কেন্দ্র করে আরো ১২টি প্রকল্পে হাত দিয়েছে এবং ইতোমধ্যে পানি প্রত্যাহার শুরু করেছে। প্রকল্প পুরোপুরি চালু হলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় গঙ্গার মতো মরুকরণ শুরু হবে। ফলে নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে। টিপাইমুখ হচ্ছে আরেক ফারাক্কা বিষফোঁড়া।

তবে টিপাইমুখ কেবল বাংলাদেশরই সর্বনাশ করবে এমন নয়। টিপাইমুখ বাঁধ ও ফুলেরতলা ব্যারেজের ফলে আসাম, মণিপুর, মিজোরাম মিলে হারাবে ৩ লক্ষ ১১ হাজার হেক্টর ভূমি। ৬৭টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মণিপুরের ১৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এটা ক্ষয়ক্ষতির সংক্ষিপ্ত চিত্র। কাজেই বাঁধের কাজ বন্ধ করার জন্য মণিপুরের বিভিন্ন সংগঠন এবং মণিপুরের গভর্ণর পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং এর নিকট একাধিকবার স্মারকলিপি পেশ করেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের সকলেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাই ভারত সরকারের কর্ণপাত না করলেও চলবে।

ভারত তার প্রতিটি প্রকল্পই বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নৌ-চলাচল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি প্রয়োজনে বলে চালিয়েছে। কোন সময় কৃষি কাজে জল সেচের জন্য ব্যবহৃত হবে– এমন বলে না। কিন্তু প্রতিটি প্রকল্পই ভারতের অন্যান্য কম পানিপ্রবাহ এলাকায় প্রত্যক্ষভাবে সেচ কার্যে ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। পানি প্রত্যাহারের ফলে প্রবাহ কমিয়ে চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়লে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে ভারত অতিরিক্ত পানি দেবে আর এটা একই সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সফলতা প্রমাণ করবে।

গঙ্গা নদী, গঙ্গার উপনদী ও শাখা নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পানি ভারত একতরফাভাবে প্রত্যাহার করার ফলে দক্ষিণাঞ্চলের গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ হয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাথাভাঙ্গা, বরাই, কুমার, মধুমতি, ভৈরব ও আড়িয়াল খাঁসহ ৩২টি এবং উত্তরাঞ্চলের ৪৪ নদীর প্রায় মৃত্যু ঘটেছে। ফলে সমগ্র সেচ ব্যবস্থার ৭৮% এখন গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ৩,০০০ মাইল জলপথ ৫০০ মাইলে ঠেকেছে (সারা দেশে ১৯৮৪ সালে জলপথ ছিল ৮,৫০০ কি.মি., ২০১০ সালে ৬,০০০ কি.মি.। পরিবহন খরচ জলপথে ১.০০= রেলপথে ২.৫০= সড়ক পথে ৪.৫০)। মৎস্য সম্পদ নিঃশেষ হয়েছে ৮০ ভাগেরও বেশী, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৪০ থেকে ৫০ ফুট নীচে নেমে গেছে। উজান থেকে প্রতি বছর ১৭৮ বি.কিউ মি. পলি বঙ্গোপসাগরে পড়তো যা বঙ্গ ব-দ্বীপ গঠনে সহায়তা করেছে, যার ফলে বাংলাদেশের ভূ-খন্ড তিলতিল করে দক্ষিণে বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও বর্তমানে পলি-বালি থিতিয়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পলি তথা উর্বরা শক্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বরং উল্টো সমুদ্র হ'তে লবণাক্ত পানি ২৮০ কি.মি. উজানে উঠে এসেছে। খুলনা অঞ্চলের লবণাক্ততা প্রায় ৬০

গুণ (৫০০ মাইক্রোমোস থেকে ২৯,৫০০ মাইক্রোমোস) বেড়েছে। নদীগুলোতে পলি ও বালি জমে ভরাট হবার ফলে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ জেলে/মাঝিমাল্লা বেকার হয়ে পড়েছে।

দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি একটি মূল্যহীন চুক্তি। এক্ষেত্রে শক্তিশালী পক্ষ না মানলে অপর পক্ষ নিরুপায়। ২০১০ সালের ০১এপ্রিল হ'তে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের পানি হিস্যা ছিল ৬২,৬৩৩ কিউসেক, বাংলাদেশ তদস্থলে পেয়েছে ৪৪,৮৩৩ কিউসেক অথাৎ ১৭,৮০০ কিউসেক কম। সিন্ধু নদের পানি নিয়ে ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে জাতিসংঘের মাধ্যমে ১৯৬২ সালে জেনেভায় সিন্ধু নদের পানি বন্টন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে পানি প্রবাহ বন্ধের সাহস দেখায়নি। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭২ সালে যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়। যার মূল কাজ হচ্ছে পানিপ্রবাহ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনের নিরিখে সংস্কার করা হয়নি। এ কমিশনের কাজ চলছে ঢিমেতালে এবং কঠোর রাষ্ট্রীয় গোপনীতার মধ্য দিয়ে। একটিমাত্র নদী নিয়ে চুক্তি হয়েছে। আরেকটি নিয়ে আলোচনা চলছে। বাকিগুলো নিয়ে কোন আলোচনা শুরুই হয়নি।

সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে ২৩৪ টি। এর মধ্যে অনেক নদী নিয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। সেগুলো দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সদিচ্ছা এবং বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত। মেকং নদী ৫টি দেশ ভাগ করে ব্যবহার করছে। পাকিস্তানের সাথে সিন্ধুসহ ৫টি নদীর পানি নিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ১৯৬২ সালে। তারপর যুদ্ধ হয়েছে ২টি কিন্তু পানি বন্ধ হয়নি। আন্তর্জাতিক নদীর আইন অনুযায়ী পানি সম্পদ ব্যবহারে উভয় রাষ্ট্র বা একাধিক রাষ্ট্রের সমান অধিকার রয়েছে। উজানের দেশ কখনো ভাটির দেশের অনুমতি ছাড়া কোন স্থাপনা বাঁধ বা ড্যাম নির্মাণ করতে পারবে না। ভাটির দেশের অনুমতি নিয়ে বাঁধ নির্মাণ করলে পানির হিস্যা নদীকে জীবিত রাখার জন্য শতকরা ৪০ ভাগ, উজানের দেশ ৩০ ভাগ এবং ভাটির দেশ পাবে অবশিষ্ট ৩০ ভাগ।

পানি বন্টন ও ব্যবহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বেশ কিছু নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত রয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৯৭ সালে মে মাসের গৃহীত সিদ্ধান্তের ৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক পানি সম্পদকে বিভিন্ন রাষ্ট্র এমন ন্যায়ানুগ ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে ব্যবহার করবে যেন এর সঠিক ও সযত্ন প্রয়োগ নিশ্চিত হয় এবং এর ব্যবহার কল্যাণকর হয়, বিশেষ করে পানি সংলগ্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং এই পানি সম্পদ সংরক্ষিত হয়।" এই সিদ্ধান্তের ৬ নং অনুচ্ছেদে আরো বর্ণিত আছে যে, "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের ব্যবহার এমন ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে হ'তে হবে যেন ভৌগোলিক সম্পদ, পানির অস্তিত্ব, পানির গতিবিধি, পরিবেশগত, পারিপার্শ্বিক ও পানি সম্পদের স্বাভাবিক চরিত্র যেন কোনভাবে বিঘ্নিত না হয়। নদীর তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূর্ণ হয়। বিশেষ করে একটি রাষ্ট্রের পানি ব্যবহারের ফলে যেন অন্য রাষ্ট্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়"।

এরও পূর্বে ১৯৬৬ সালে হেলসিংকি চুক্তি ২ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের পরিবর্তন ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে এমন যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে আন্তঃসীমা প্রতিক্রিয়া পরিহার করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা হ্রাস করা সম্ভব হয়"। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের এসব অনুচ্ছেদগুলি স্পষ্ট, বৈষম্যহীন ও ন্যায্য। আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রকে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তাবলী মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক আদালতের মুখোমুখি হ'তে হবে। কিন্তু নিপীড়িত কোন দেশ যদি বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহলে আখেরে ভোগান্তি হবে সে দেশের গণমানুষদের।

বাংলাদেশের সকল সরকারই সবসময় ভারত তোষণনীতি অনুসরণ করে চলেছে। ফলে সবসময় পানি সমস্যা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মণি ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি (?) টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের স্বার্থের বিপক্ষে যায় তাহলে আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' ফারাক্কার পানি সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করে চীন, ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে চুক্তি করে পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উজানে ৫০ ফুট উচু একটি জীবন রক্ষা বাঁধ বানাতে হবে। এটি হবে একাট বিশাল রিজার্ভার এবং একই সঙ্গে এ বাঁধই পারবে সকল সমস্যার সমাধান করতে। তখন ফারাক্কা বাঁধ এবং কলকাতা শহর ১৫ ফুট পানির নীচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ভারত একতরফাভাবে যে পানি প্রত্যাহার নীতি গ্রহণ করেছে তাতে বাংলাদেশ অনিবার্যভাবেই শুকিয়ে মরবে। কিন্তু সরকার কোন প্রতিবাদ করছে না বা জাতিসংঘে কোন অভিযোগও উত্থাপন করছে না। প্রয়োজন জনগণের সচেতন প্রতিবাদ।

আহত বরেন্দ্রের ঘাড়ে মরণ খাঁড়াঃ

- ২০১১-২০১২ সালে বোরো চাষ হয় ২.৮২ লক্ষ হেক্টর জমিতে (প্রায় ২১

লক্ষ বিঘা)। বিঘা প্রতি গড়ে ২০ মণ ধান উৎপাদন ধরলে মোট উৎপাদিত ধানের পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ মে.টন বা ১৭ কোটি কেজি। বিশেষজ্ঞদের মতে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে খরচ হয় ৩,৫০০ লিটার পানি। কাজেই ১৭ কোটি কেজি ধান উৎপাদন করতে ৬ লক্ষ কোটি লিটার পানি খরচ হয়। ৬ লক্ষ কোটি লিটার = ৬০০ কোটি কিউবিক মিটার = ৬০০ কোটি মে.টন পানি।

পুকুর ব্যবস্থাপনা:

- বরেন্দ্র এলাকায় ৭০ হাজার পুকুর রয়েছে। পুকুরের গড় আয়তন .৫০ একর ধরলে মোট আয়তন দাঁড়ায় ৩৫ হাজার একর =১৪.২ হাজার হেক্টর = ১৬.৬ কোটি বর্গগজ। প্রতি পুকুর গড়ে ৪ গজ গভীর করলে মোট ৬৬.৪ কোটি ঘনগজ এরিয়া হবে। ৬৬.৪ কোটি ঘনগজ = ৬০.৭ কোটি ঘন মিটার। এর মধ্যে ২৫% ঢাল বাদ দিলে ৪৫.৫ কোটি কিউবিক মিটার পানির ধারণ ক্ষমতা তৈরী হবে। এর মধ্যে অতিরিক্ত পানি বাড়বে ৩৩.৮কোটি কিউবিক মিটার। যার মধ্যে ৩৭ কোটি কিউবিক মিটার পানি কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। বাকিটা মাছ চাষসহ দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে। সমস্ত পুকুর খনন করতে (৫০শ.পুকুর ২ লক্ষ টাকা হিসাবে) মোট ১,৪০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে যা ৫,২৫০টি ডীপ টিউবওয়েল বসানোর ব্যয়ের সমান। ৭,০০০টি ডীপ টিউবওয়েল থেকে পানি পাওয়া যাবে ৯১ কোটি কিউবিক মিটার । ৭,০০০টি ডীপ টিউবওয়েল থেকে ধান উৎপাদন হবে ৮লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন। যার বাজার মূল্য ১৭০০ কোটি টাকা।
- পুকুরের ৩৭ কোটি কিউবিক মিটার পানি দিয়ে ৪লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন গম উৎপাদন হবে। যার বাজার মূল্য ১,২০০ কোটি টাকা। মাছ উৎপাদন হবে ১,০৫০ কোটি টাকার (প্রতি ৫০শ. পুকুরে ২০০ কেজি এবং প্রতি কেজি ১৫০/= দর হিসাবে)। এছাড়া দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের সামাজিক মূল্য আর্থিক মূল্যে হিসাব করা কঠিন। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে ৮৭,৫০০ মেগাওয়াট যা সারা দেশে ৮দিন বিদ্যুৎ ব্যবহারের সমান এবং যার দাম ৮৭,৫০০X৫০০০/= =৪৩.৭৫ কোটি টাকা যা দিয়ে প্রতি বছর ২,৯৩০টি করে পুকুর খনন করা সম্ভব।

খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা:

বোরো মৌসুমে আবাদ হয় ২.৮২ লক্ষ হেক্টর জমির ৪০% জমিতে ধান চাষ করে বাকি ৬০% জমিতে গম উৎপাদন করলে অবস্থা দাঁড়াবে নিম্নরূপ–

- ৪০% জমিতে ধান উৎপাদিত হবে =৭ লক্ষ মে. টন (১৪০০ কোটি টাকা)। পানি খরচ হবে = ২৪৪ কোটি মে.টন।
- ৬০% জমিতে গম উৎপাদন হবে = ৫.৭ লক্ষ মে.টন (১,৫২০ কোটি টাকা)। পানি খরচ হবে = ৪৬ কোটি মে.টন।
- মোট পানি খরচ হবে = ২৪৪+৪৬ = ৩০০ কোটি মে.টন।
- মোট খাদ্য উৎপাদন হবে (ধান + গম) হবে = ৭+৫.৭ = ১২.৭ লক্ষ মে.টন।
- পানি বাঁচবে = ৬০০ - ৩০০ = ৩০০ কোটি মে.টন। খাদ্য কমবে = ১৭.০০ - ১২.৭ = ৪.৩ লক্ষ মে.টন।
- আর্থিক মূল্য ১৭ লক্ষ মে.টন ধান = ৩,৪০০ কোটি টাকা।
- ৪০% ধান এবং ৬০% গম = ১,৪০০ + ১,৫২০= ২,৯২০ কোটি টাকা।
- টাকা কমবে ৩,৪০০-২,৯২০ = ৪৮০ কোটি টাকা। মোট উৎপাদন কমবে = ৪.৩ লক্ষ মে.টন ধান।
- অন্যদিকে খননকৃত পুকুর থেকে অতিরিক্ত গম উৎপাদন হবে =৪.৫ লক্ষ মে.টন যা বর্ণিত ঘাটতি পূরণ করে উদ্বৃত্ত থাকবে ৪.৫ - ৪.৩=০.২ লক্ষ মে.টন। ৪.৫ লক্ষ মে.টন এর বাজার মূল্য ১,২০০ কোটি টাকা। ১,২০০ কোটি টাকা -পূর্বের ঘাটতি ৪৮০কোটি টাকা =৭২০ কোটি টাকা যা (৩.৬ লক্ষ মে.টন ধানের দাম) উদ্বৃত্ত হবে। এলাকা খাদ্য, পানি, মাছ, তেল, ডাল, সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।
- বর্তমানে ২০ লক্ষ মে. টন খাদ্য উদ্বৃত্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হবে ৩.৬ লক্ষ মে.টন। গমের বদলে তৈলবীজ বা ডাল জাতীয় ফসল হ'তে পারে, যেগুলো আমাদের আমদানী করতে হয়। এক্ষেত্রে আমদানী কমবে। ধান চাষের সময় -গম চাষের সময় = অতিরিক্ত সময় বাঁচবে ৪৫দিন। এ সময়ে লাল শাক, পালং শাক ইত্যাদি ধরনের সংক্ষিপ্ত সময়ের সবজি চাষ করে অতিরিক্ত টাকা আয় করা সম্ভব।

বছরে মোট পানি সঞ্চিত হবে–

(নাচোল সদর থেকে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী)

- ডীপ টিউবয়েল থেকে ৬০০-৩০০=৩০০ কোটি মে.টন এবং খননকৃত পুকুর ' থেকে অতিরিক্ত ৩৩.৮কোটি মে.টন = ৩৩৩.৮কোটি মে.টন। যা ১৪ হাজার ডীপ টিউবয়েল থেকে বোরো মৌসুমে উত্তোলিত পানির অর্ধেকের বেশী (৫৫.৬%)।
- বিগত ৬ বছরে গড়ে পানির সর্বনিম্ন স্তর বছরে ২.২২ মিটার (৭.২৮ ফুট) হারে কমেছে। ৯ বছরে এ পরিমাণ প্রায় ১.৮ মিটার (৫.৯) ফুট। ২০০৪-২০০৬ এ পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। এই ৩ বছরে কমার গড় ছিল ২.৬৭ মিটার (৮.৭৬) ফুট। কম বৃষ্টিপাত এবং বর্ষা মৌসুমে ডীপ মেশিন চলার কারণে এ অবস্থা হয়েছে।
- ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরের পানির স্তরের উঠানামা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ সময়ে পানি সর্বোচ্চ ২১.২৭-২২.৫৪ অর্থাৎ ১.২৭ মিটারের (৪.১৭ ফুট) মধ্যে উঠানামা করেছে। ২০০৪ সালের পর পানির স্তর ২২.৬৪-২৯.৭১ অর্থাৎ ৭.০৭ মিটার (২৩.২০ ফুট) কমেছে। আবার ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরের পানির স্তরের উঠানামা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ সময়ে পানি সর্বনিম্ন ৯.৮১-১১.৭৮ অর্থাৎ ১.৯৭ মিটারের (৬.৪৫ ফুট) মধ্যে উঠানামা করেছে। ২০০৪ সালের পর ৮বছরে পানির সর্বনিম্ন স্তর ১২.০৫-২৮.৩৩ অর্থাৎ ১৬.২৮ মিটার (৫৩.৪১ফুট) কমেছে।

কতদিনে পানির স্তর স্বাভাবিক অবস্থায় আনা সম্ভব?

- ১৯৮৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে গড় বার্ষিক পানি রিজার্ভের হার ১০.২৩

মিটার (৩৩.৫৬ ফুট)। ২০০৫-২০১২ সাল পর্যন্ত ০৮ বছরের গড় বার্ষিক পানি রিচার্জের হার ২.৩ মিটার (৭.৫৫ ফুট)।

- ১৯৮৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত ৩য় কোয়ার্টারে (১৫ জুলাই-১৫ অক্টোবর - বর্ষাকালে) পানি বৃদ্ধির গড় পরিমাণ ৭.৪৭ মিটার=২৪.৫০ ফুট।
- ২০০৫-২০১২ সাল পর্যন্ত ৩য় কোয়ার্টারে (১৫ জুলাই-১৫ অক্টোবর- বর্ষাকালে) পানি বৃদ্ধির গড় পরিমাণ ০.৯৫ মিটার =৩.১২ ফুট।
- পুকুর খনন প্রকল্প সম্পন্ন হলে এবং নতুন কৃষি উৎপাদন পলিসি বাস্তবায়ন হলে বছরে রিচার্জ হ'তে থাকবে বছরে (২.৩মি.+২.৩ এর ৫৫.৬%) ৩.৫৮ মি.হারে। কাজেই ৩.৫৮মি. - ১.৮মি.= ১.৭৮মি. বছরে সঞ্চয় হ'তে থাকবে। ফলে ১৮.৫২মি. - ১.৭৮মি. = ১০.৪ বছরে ১৯৮৯ সালের সর্বোচ্চ স্তর ৯.৮১ মিটারে আনা সম্ভব।

সুপারিশমালা

- পর্যাপ্ত এবং মানসম্মত পানি প্রাপ্তি একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে জাতীয় পানি নীতিতে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- যৌথ নদী কমিশনের সভা নিয়মিত হ'তে হবে এবং সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ্যে ঘোষনা করতে হবে।
- উজানের প্রতিটি নদীর জন্য পৃথক পৃথক যৌথ নদী কমিশন গঠন করতে হবে এবং পানিপ্রবাহের আপডেট পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।
- চীন, ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সহযোগে যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের সমস্যা সমাধানের জোর কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতের আশ্রয় নিতে হবে।
- হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উজানে পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণ করা এবং পদ্মার দু'পাড় উচু করতে হবে।
- বরেন্দ্র এলাকায় খরা মৌসুমে কৃষি প্যাটার্ণ পরিবর্তনের জন্য সরকারী উদ্যোগ চাই।
- বরেন্দ্র এলাকার সকল পুকুর/জলাশয় খনন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী পুকুর/জলাশয়সমূহের জন্য গণমুখী ব্যবস্থাপনা পলিসি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরসমূহের জন্য বিশেষ প্রণোদনা পলিসি গ্রহন করতে হবে।
- বরেন্দ্র এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে কম পক্ষে ৩% কভারেজ বাড়াতে হবে যাতে করে মেঘধারণ ক্ষমতা বেড়ে অধিকতর বৃষ্টিপাত ঘটে।
- ভূ-গর্ভের পানির জন্য গবেষনা কার্য পরিচালনা করতে হবে।

শেষ কথা

মানবাধিকারের ধারণা কেবল নিপীড়ন হ'তে মুক্তি কিংবা বাক্‌স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানবাধিকার বলতে মানুষের বেঁচে থাকা, শারীরিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সম্মানজনক অবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সকল অধিকারকে বোঝায়। "নিরাপদ পানিতে প্রবেশাধিকার মানুষের একটি প্রাথমিক এবং মৌলিক চাহিদা আর সেই কারণেই এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার"-কফি আনান, সাবেক ইউএন সেক্রেটারী জেনারেল।

মানবাধিকার প্রবর্তন ও সংরক্ষণ মূলত রাষ্ট্রের। পানি মানুষের একটি অন্যতম অধিকার হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। কারণ জীবনধারণের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার পূর্ণরূপে উপভোগের জন্য পানি অপরিহার্য। ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'সহ ২০০০ সালের 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' পর্যন্ত অনেক আন্তর্জাতিক আইনে পানি অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

কিন্তু আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত পানি প্রাপ্তি একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯ এ এবং পূববর্তী খসড়ায় স্বীকৃতি পেলেও বর্তমান খসড়ায় (২০১৩ যা মন্ত্রীসভা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে) বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কাজেই বিষয়টি মনোযোগ দাবী করে। বাংলাদেশের সার্বিক পানি সমস্যা এবং পানির উপর সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে এ্যাকশন এইডের সহায়তায় উত্তরাঞ্চলের ৮টি সংস্থা মিলে ওয়াটার কমোনস্ নামে একটি জোট গড়ে তুলে উপরোক্ত বিষয়ে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে মানুষকে সচেতন করা এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের গণমানুষের স্বার্থে পলিসি গ্রহণে সহযোগিতা করার প্রচেষ্টার অংশ এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা ভূ-রাজনীতির শিকার। সচেতনতাই আমাদের অস্তিতের শর্ত।

তথ্যসূত্র:

- National Food Policy Capacity Strengthening Programme -Ministry of Food and Disaster Management
- A Research Journal of South Asian Studies - Iram Khalid
- পানি নীতি, ব্যবস্থাপনা এবং পানিতে অধিকার –এএলআরডি
- মরণ ফাঁদ বাঁধের কবলে বাংলাদেশ– প্রফেসর মুহাম্মদ মূসা
- পানি সম্পদ ও অভিন্ন নদী – রাজশাহী ওয়াটার কমোনস্ ফোরাম
- Uses, Demand and Availability Water in Bangladesh An Overview-M. Shahjahan Mondal, Ph.D.
- Sharing Transboundary Water: The Bangladesh Experience - Abu Raihan M Khalid
- Hydrological Changes in Bangladesh - M. MoniruL Quder Mirza.
- বিডিও'র নিজস্ব অনুসন্ধানপত্র।

আকতার হোসেন

নির্বাহী পরিচালক, বিডিও, নওগাঁ

(নভেম্বর ২০১৪, নওগাঁ জেলায় আয়োজিত 'বরেন্দ্র এলাকায় পানি দুর্যোগ: সমাধানে বাস্তবসম্মত নীতি' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত)

শ ফি আ হ মে দ

নজরুল রচনার যেদিকটায় তেমন আলো পড়েনি

এমনটা আমার অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গবিভাগের আগেই এই মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং নজরুল যে সজ্ঞান না থেকে এক ধরনের জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হলেন, সে ওদের দু'জনের জন্যই বোধ হয় মঙ্গলেরই ছিল। অনুমান করার চেষ্টা করি, রবীন্দ্রনাথ ছিয়াশি বছরে বেঁচে আছেন, বাস্তব কারণেই তিনি হয়ত তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সচল থাকতে পারতেন না, কিন্তু অমন অবস্থায় দেশভাগের রক্তাক্ত মানচিত্রটা তাঁর মস্তিষ্কেও কতটা রক্তক্ষরণ করতো, তা কি পরিমাপযোগ্য? আর কাজী নজরুল ইসলামের বয়সতো তখন হত আটচল্লিশ অতিক্রান্ত। যে মাপের তেজস্বী ব্যক্তি তিনি ছিলেন, তার নিরিখে তিনি হয়ত শুধুই তারুণ্যের সীমা অতিক্রম করতেন, তা হলে সাতচল্লিশে কী প্রতিক্রিয়া হত তাঁর মধ্যে! ওপার বাংলার বর্ধমানের চুরুলিয়ায় জন্ম, বহুবিধ কারণে কোলকাতার সমাজে তাঁর একটা সিদ্ধি ও স্বীকৃতি ছিল, ছিল এক অমৃত অবস্থান। রাজনীতির তাত্ত্বিক মোজাফফর আহমেদ থেকে সাহিত্যসেবক শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে হৃদয়ের সখ্য, আবার গাঁয়ের গানের গোষ্ঠী লেটোর দলেও যোগদান এসব যেমন ছিল, তারই সমান্তরালে তো ছিল ময়মনসিংহের ত্রিশালের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ, কুমিল্লার প্রতি টানকেও তো ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই।

এমন সব বাস্তব উপাদানের সঙ্গে সন্ধিরচনার সম্পর্ক যেখানে বিদ্যমান, সেই অখণ্ড বাংলা ভাগ হয়ে যাবে হিন্দু আর মুসলমানের সংখ্যার ভিত্তিতে, বাস্তুভিটা ছেড়ে যাবে লাখো মানুষ, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বিষের বাঁশির রাগ বাজবে ইস্রাফিলের শিঙ্গায়, একটু আগে বেঁচে থাকা মানুষ লাশ হয়ে যাবে প্রতিবেশীর মারণিক আঘাতে, সজ্ঞানে নজরুল যদি অমন অভিজ্ঞতার শরিক হতেন, কী প্রতিক্রিয়া হত তাঁর, কী লিখতেন তিনি, যিনি সমকালের অশনিসংকেত দেখে লিখেছিলেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী বল মরিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'? এসব কথা ভাবতে গিয়েই মনে হয় কোন এক বিধির বিধানেই বুঝি নজরুল ১৯৪৭-এর খুনে সময়ের তাপ অনুভব করেননি।

নজরুলকে নিয়ে লিখতে গিয়ে নিজের মনের কষ্ট বোঝাতে গৌরচন্দ্রিকা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না দেখা গেলেও অমুসলিমদের ওপর বিভিন্ন বিরতিতে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামাজিক সম্প্রীতি যে সংকটের মধ্যে পড়েছে, সেকথা না বললে এবং এজন্য উদ্বেগের কথা না জানালে সত্যকে আড়াল করার অপরাধে জড়িয়ে পড়ার সার্বিক ঝুঁকি থাকে। নিহত হচ্ছে মানুষ, সন্তান মোর মার, চাপাতির অভিন্ন ধরনের আঘাতই জানিয়ে দিচ্ছে, এই আধুনিক কালে ক্ষুদ্রাকার মারণাস্ত্র যখন অনেকের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, তখন এমন বীভৎস মধ্যযুগীয় কায়দায় খুন করার রীতির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা রয়েছে যে, মধ্যযুগীয় জীবনধারাই সত্য এবং অনুকরণীয়, আধুনিকতাকে বর্জন করাই শ্রেয়। আবার এই ঘাতকরাই আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার এই আবির্ভাব একদিকে যেমন দুশ্চিন্তার, অন্যদিকে এমন অবস্থাই আমাকে বার বার তাড়িত করছে

নজরুলের আজন্মচর্চিত অসাম্প্রদায়িকতার বাণীর প্রতি। তাই ওই ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি বঙ্গবিভাগের বেদনাদায়ক স্মৃতিকাতরতা শুধু নয়, আজকের বাংলাদেশ মনে করিয়ে দিচ্ছে, নজরুলের মত কেউ যদি এখন থাকতেন, গভীর নির্ঘোষে সমাজের সিংহভাগ আধমরা মানুষকে ঘা দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন, তা হলে বাঙালি তার অনাদি উদার মানবতাবাদে উজ্জীবিত হতে পারতো।

যাই হোক, এমন দুঃখভারাক্রান্ত বিষয় নিয়ে লিখতে চাই না। চাপা আবেগের ভারমুক্তির একটা গতিবেগে কথাগুলো যেন ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। এই মিতকলেবর লেখাটায় আমি নজরুলের রচনার বা চিন্তার যে দিকটা উন্মোচন করতে চাই, তা নিয়ে লেখা-জোখা খুব একটা চোখে পড়েনি। নজরুল যে তার চারপাশের সমাজটা নিয়ে ভাবিত ছিলেন, তা নিয়ে আলোচনা হয়। 'বিদ্রোহী' বা 'ফরিয়াদ' কবিতায় তিনি যে ঐতিহাসিক ধারায় সমাজ-বৈষম্য নিয়ে কথা বলেছেন, বেশ উচ্চকণ্ঠে, সেসব বিষয়ে অনেকে আলোকপাত করেন এবং তা খুবই প্রাসঙ্গিক। সাম্যবাদকে উপজীব্য করে তাঁর অনেকগুলি কবিতা থেকে বারে বারে উদ্ধৃতি দেয়া হয় এটা বোঝানোর জন্য যে, তিনি মানুষের মধ্যে সমতা ও পারস্পরিক মর্যাদার ওপর গুরুত্ব দিতেন। এই বিষয়টা তাঁর কর্ম ও জীবনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, যেন এসব নিয়ে বিতর্কের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাবনার অন্য দিকটা যথোচিতভাবে আলোচিত হয় না, এই দিকটায় তেমন আলো পড়ে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে তাঁর যে গভীর, হৃদ্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ, যেখানে তিনি বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানকে তিনি গালাগালির সম্পর্ক থেকে গলাগলির নৈকট্যে আনার চেষ্টা করেছেন, সে চেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাননি, তাই তিনি অভিমান করে বিদায় নিচ্ছেন। এমন অসাধারণ ভাষণ আমাদের পরানের গহীণ ভিতরটা ছুঁয়ে যায়, আমাদের তথাকথিত আধুনিক ভদ্রতার মুখোশটা যেন খুলে দেয়, কিছুটা অপরাধবোধও জাগিয়ে তোলে আমাদের মধ্যে। অসাধারণ কণ্ঠে সেই অমিয় শব্দাবলীর আবৃত্তি যখন শুনি, নিজেকে বেশ ক্ষুদ্র মনে হয়। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বোঝা যায়, হৃদয় উন্মুক্ত করা ওই ভাষণে রোমান্টিকতার ঐশ্বর্য যতটা অস্তিত্বমান, বিশ্লেষণের দ্যুতি কিন্তু সমপরিমাণে নেই। তাই ওই ভাষণ আমাদের রোদনে প্ররোচিত করে, ক্ষোভে তাড়িত করে না।

বিশ্লেষণ বা যুক্তি-তর্কের বিষয়গুলো প্রধানত গদ্যের জগতের উপাদান। নজরুলকে আমরা প্রায় সর্বতোভাবে কবি বলেই বিবেচনা করি। আগের অনুচ্ছেদে যে ভাষণের কথা উল্লেখ করলাম, তার মধ্যেও যে বেদনা মুখ্য হয়ে উঠেছে, তাকে ভাষা দিতে কবি নজরুল স্বতপ্রণোদিতভাবে কাব্যিকতার দিকেই ঝুঁকেছেন, সমাজতত্ত্বের যেসব উপাদান সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণে জরুরি, নজরুল তা নিয়ে আলোচনা করেননি, এটা মূলত তাঁর মনোজগতের দীর্ঘশ্বাস, মননের বন্ধুর পথটা তার পরিক্রমায় তেমন প্রাধান্য পায়নি।

নজরুলের যেসব গদ্য রচনা নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা হয়, তার মধ্যে *ব্যথার দান* খুবই উল্লেখযোগ্য। আবার এই গ্রন্থের সবটা জুড়েই অনুভব ও আবেগের ঘনত্ব যতটা মনোযোগ দাবি করে, গদ্যের যুক্তিতর্ক তা থেকে অনেক দূরবর্তী। আলোচনা বা মঞ্চায়নে তাঁর *মৃত্যুক্ষুধা*-র প্রসঙ্গটা আমরা দেখতে পাই। এটির বিষয় নিশ্চয়ই সমাজবিজ্ঞানের বৃত্তকে স্পর্শ করে, কিন্তু তারপরেও তো এটা সেরকমই রচনা, যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয়ে থাকে fiction। (এই কথাটার কোন যুৎসই বাংলা প্রতিশব্দ আমরা এখনো নির্মাণ করতে পারিনি)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নজরুল রচনাসম্ভারকে যদি বিবেচনা করি, তা হলে অনাদৃত ও কম আলো পড়া একটা অঞ্চল তাঁর যুক্তিবাদী, সমাজসম্পৃক্ত এবং সুচিন্তাসমৃদ্ধ গদ্যরচনার মননের সন্ধান দেয় আমাদের।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে নজরুলের একটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যার নাম *যুগবাণী*। এটিকে ভিন্নতর একটি গ্রন্থ হিসেবে বিচার করার মধ্যে কিছু সাহিত্যিক ঝুঁকি আছে। ১৯২০ সালে কলকাতা থেকে *নবযুগ* নামে একটা সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হত। মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল ওই পত্রিকা। নজরুল ওই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। স্বাভাবিকভাবেই দৈনিক পত্রিকার এমন নিবন্ধ হিসেবে সেগুলোতে তখনকার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খবরের কাগজের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, সম্পাদকীয় নিবন্ধও যথারীতি তার বাইরে থাকে না। খবরের কাগজের শেষ গন্তব্য ঘটে সের দরে কেনা ক্রেতার কাছে। (তখনকার দিনে ওজনের পরিমাপক হিসেবে কিলোগ্রাম ছিল না, সেকথাটা মনে পড়ে গেল।) নিবন্ধকার অনেক সময় নিজের ইচ্ছায় বা দুর্বলতায় সেসব সংরক্ষণ করেন। ১৯২০ সালে দৈনিক *নবযুগ* পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের এমন কিছু নির্বাচিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের সংকলন হিসেবে ১৯২২ সালে *যুগবাণী* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনকার সরকার এই বই বাজেয়াপ্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কবিতায় যেমন, তেমনি গদ্যরচনায়ও নজরুলের লেখনী কতটা অগ্নিগর্ভ ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা *যুগবাণী*-র বিষয়-আশয়কে সহ্য করতে পারেনি। নিবন্ধকার নজরুলের তীব্র ও দূরদর্শী ভাবনা এবং গদ্য রচনা ভঙ্গির উদাহরণ হিসেবে প্রথম নিবন্ধ 'নবযুগ' থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

> আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, 'মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে?' এই 'খোদার উপর খোদকারি' শক্তিকে দলিত করো। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করো!' আল্লাহু আকবর বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণ শিখ ফেজের রক্তরাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্ঠির ভূলুণ্ঠিত রবাব আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্ঠি আমাদের টুটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব'। এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল 'আবিরাবির্ম এধি'! আবির্ভাব হও!! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় নিবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে, 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!' নজরুলের সমাজসচেতনতা সহজেই বোধগম্য। এই শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ তিনি ধার করেছেন বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের উদগাতা আই.সি.এস উপাধিধারী গুরুসদয় দত্তের কাছ থেকে। পরের নিবন্ধ 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' থেকেও তার দেশাত্মবোধ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ডায়ার হলেন সেই নরপিশাচ, যার আদেশে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের সহস্র মানুষকে গুলি করা হয়েছিল। সবশেষে অনুচ্ছেদে নজরুল বলছেন, 'এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।' আবেগতাড়িত কণ্ঠস্বর নজরুলের।

আমাদের এই প্রকাশনা সাক্ষরতা বুলেটিন-এর জন্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় উল্লেখ করতে চাই। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় স্বাদেশিক বিষয় ও দেশে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবহার এবং বিদেশি জিনিস বর্জনের এক বিশাল উত্তেজনা গড়ে উঠেছিল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকরা বিবিধ সংস্কার সাধন করেছিল। তার অনেকটাই ইতিবাচক হলেও এই শিক্ষাধারার মধ্যে উপনিবেশবাদীদের চিন্তাধারা এবং তাদের জীবনধারার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। এভাবেই দেশে একটা তাঁবেদার মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশপ্রেমে জাগ্রত করার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠকরা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেকথা জেনে নজরুল স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত বোধ করেছিলেন, সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি লিখলেন:

তাই বিজাতির বিভিন্ন শৃঙ্খল কাটিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা আজ এত আনন্দধ্বনি করিতেছি। যাহাতে এই জাগরণ-যুগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাহিরে না হইয়া অন্তরে হয়, সেই জন্যই আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন-প্রকারেণ দুই-একটা ঠাটকবাজি-গোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়; অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। তাই, এই সহযোগিতা বর্জনের দিনে, 'খোশখবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা' স্বরূপ আমাদের দীর্ঘ পরিপোষিত আশার কার্যে পরিণত হইবার কথা শুনিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনায় কাঙ্ক্ষিত দেশজ শিক্ষাদানের উদ্যোগ তেমনভাবে সার্থক হয়ে ওঠেনি। 'জাতীয় শিক্ষা' নামক এক নিবন্ধে নজরুল এ বিষয়ে তার নিন্দা ও পর্যালোচনা পেশ করলেন। তিনি লিখলেন 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সময় দেখা গেছে, অনেক দোকানদার বা ব্যবসায়ী একটা কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। তারা কৌটা বা বাক্সের ওপর থেকে বিদেশী 'জিনিসের ট্রেডমার্ক বা চিহ্ন চাঁচিয়া-ছুলিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহাতে একটি স্বদেশী মার্কা মারিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতেন'। নতুন যে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং যার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশীয় ধ্যান ধারণা শিখবে, চর্চা করবে, এর মাধ্যমে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, এমন প্রত্যাশা জাতির। এবং যেসব কিশোর বা তরুণ এমন বিদ্যালয়ে পাঠ লাভ করবে তারাই তো 'আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল'। কিন্তু নজরুলের মনে হয়েছে, এবং সেই ধারণাই সত্য যে, জাতীয় বিদ্যালয়ে যা চলছে, তা ওই ব্যবসায়ীদের ট্রেডমার্ক তুলে স্বদেশী দ্রব্য বানানোর মত অসৎ পন্থা। নজরুল বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বলছেন, 'শিক্ষায় যা একটু মৌলিকতা দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। ও-রকম এক-আধটু নতুনত্ব যে-কেহ একটা নতুন জিনিসে লাগাইতে পারে'। নজরুলের প্রত্যাশার অবলোপ এবং পর্যবেক্ষণের যথার্থতা খুবই বাস্তবসম্মত। তাঁর নিজের ভাষায়:

যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ঐ সরকারি বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না। যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা-বুলানো মাত্র, তাহাকে কি বলিয়া কোন লজ্জায় 'হামারা' বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব–যাহাদিগকে মুখ ভেঙচাইয়া বাহির

হইয়া আসিয়াছি আবার তাহাদেরই হুবহু 'হনুকরণ' করিতেছি। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা–পদ্ধতি ও শিক্ষাদাতা কর্তাদের সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা খারাপ বলিতে আমাদেরই বক্ষে বাজিতেছে। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভণ্ডামি দিয়া কখনও মঙ্গল-উৎসবের কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিবে না। শুধু চরকা দিয়া সূতা কাটানো ছাড়া এ-ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এ-দেশের আবহাওয়ার উপযোগী। এসবই ইংরেজি কায়দা-কানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগরা জুতা পরাইয়া এদেশি করা; অথবা সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গোছ।

শুধু অনুকরণের মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। এই অনুকরণের মধ্যে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হল হীনমন্যতা। হনুমান মানুষের নানা রকমের কাজ ও ভঙ্গি অনুকরণ করে থাকে, তাই নজরুল শ্লেষাত্মকভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের এমন শিক্ষাধারাকে 'হনুকরণ' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। নজরুলের এই যে চিন্তা, এই যে প্রতিক্রিয়া তা তাঁর প্রত্যাশা পূরণ না হবার বেদনা হিসেবে দেখলেই হবে না। বুঝতে হবে যে, নজরুল কী গভীর দেশাত্মবোধ ধারণ করতেন। রবীন্দ্রনাথও বিষয়টা বুঝেছিলেন, স্বাদেশিকতার নানা ধরনের উত্তাপ ছড়ানো বিষয়ের মধ্যে যে ফাঁকি আছে, তা নিয়ে তিনি লিখেছেন। এমনকি *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী দ্রব্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার আন্দোলনের সরাসরি নিন্দা করেছেন। তিনিও ব্রিটিশ ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি সমর্থন জানাতে পারেননি। তাঁর অন্য ধরনের সামর্থ্য ছিল, দূরদৃষ্টি ছিল এবং সহযোগিতা আদায়ের জন্য আন্তরিক উদ্যোগ ছিল বলেই তিনি কোলকাতা থেকে দূরে বোলপুরে বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছেন, স্বদেশী জ্ঞান, লোকজ জ্ঞান ও বহির্বিশ্বের জ্ঞানকে সমাহৃত করার জন্য। নজরুলের জন্য এমন কোন অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না, কিন্তু জাতির শিক্ষা বিষয়ে তার উদ্বেগ ছিল গভীর ও আন্তরিক।

বোঝা যায়, *নবযুগ* পত্রিকায় জাতীয় বিদ্যালয় নিয়ে নজরুলের লেখা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অনেকে তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অন্য একটি নিবন্ধ প্রকাশ করলেন। বোঝানোর চেষ্টা করলেন, যাকে আমরা আজকাল বলে থাকি insider's comment অর্থাৎ আমি নিজে এই উদ্যোগ সমর্থন করি, কিন্তু শুভ বোধেই তার ত্রুটি দেখতে চাই, দেখাতে চাই। তিনি লিখলেন:

জাতীয় (ন্যাশনাল) বিদ্যালয় লইয়া একটু খোঁচা দিয়াছি, তাহা অন্য কোনো ভাব-প্রণোদিত হইয়া নয়। জাতীয় জিনিস লইয়া জাতির প্রত্যেকেরই ভালা-মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার আছে। তাহা ছাড়া 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম', ভুল সকলেরই হয়; নিজের ভুল নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদেরই জাতীয় বিদ্যালয়ের যে ভুল আমাদের চোখে পড়িবে, তাহা আমাদের শোধরাইয়া লইতে হইবে। প্রথমে কোনো বড় কাজ করিতে গেলে অনেক রকম ভ্রম-প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক জানি, এবং তাহাকে ক্ষমা করিতেও পারা যায়–যদি জানি যে তাঁহারা জানিয়া ভুল করিতেছেন না। কিন্তু যদি দেখি যে, এই সব হোমযজ্ঞের হোতারা জানিয়া-শুনিয়া ভুল করিতেছেন বা জাতীয়-শিক্ষারূপ পবিত্র জিনিসের নামেও নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছেন, তাহা হইলে হাজার অপ্রিয় হইলেও আমাদিগকে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। পবিত্র কোনো জিনিসে কীট প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকাও অপরাধ।

কিন্তু এরপর নজরুল যা লিখলেন, তা যেন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার হালচালের বিষয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। এইসব জাতীয় বিদ্যালয়ে 'কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক' নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এবং এই নিয়োগের সঙ্গে স্বার্থসিদ্ধি ও দুর্নীতির যোগ আছে। উদ্দেশ্য মহৎ হলে তার পন্থাটাও সৎ হতে হবে। এখানেই গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজনৈতিক কথাও এনেছেন। বলছেন, যেসব নেতা বা কর্মী লোক-দেখানো ব্রিটিশবিরোধী আচরণ করেন এবং তার দ্বারা জনগোষ্ঠীর সম্মান ও আনুগত্য দাবি করেন, তাদের মধ্যে ফাঁকি আছে, অসততা আছে। 'মিথ্যা ভণ্ডামি' দিয়ে 'দেশবাসীর বাহবা' পাবার প্রচেষ্টা আখেরে ভাল ফল বয়ে আনতে পারে না। আমাদের দেশেও শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষার উন্নতির জন্য নানারকম উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে নানারকম দুর্নীতির অস্তিত্ব আমাদের প্রচেষ্টার সার্থকতাকে ব্যাহত করছে। এইসব বিষয় আমরা সবাই জানি, কিন্তু প্রতিকারের জন্য তেমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। নজরুল তাঁর 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নিবন্ধের শেষ কথায় যা বলেছেন, তা আমাদের জন্য আজও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। নজরুলের চাওয়াই আমাদের প্রার্থনা। উপসংহারে তাঁর কথাই আবার উল্লেখ করি।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। 'মেদা-মারা' ছেলের চেয়ে সে হিসাবে 'ডানপিটে' ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের 'জান' থাকে না; আর যাহার জান নাই, সে-'মোর্দা' দিয়া কোনো কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে-প্রাণ-শক্তি আর কর্ম-শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শত্তুরে যেন ইহাকে গোলামখানা বই তেলাম-খানা না বলিতে পারে।

শফি আহমেদ
সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার
পি-কে-এস-এফ

ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এখনো পর্যাপ্ত নয়

প্রায় অর্ধযুগ পর একই সাথে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ টাকার অংকে এবং শতকরা হিসেবে বৃদ্ধির ঘটনা ঘটল। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র একবারই (২০১১-১২ অর্থবছরে) এরূপ বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তী বাজেটগুলোতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকার অংকে বাড়লেও কখনোই তা শতকরা হিসেবে বাড়েনি, বরং প্রতি বছর তা কমতে কমতে গত অর্থ-বছরে মাত্র ১০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়নের হিসেব করে দেখা গেছে টাকার অংকে এই বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না বরং ক্রয় এককে তা পূর্বের তুলনায় বেশ কমে গিয়েছিল।

সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট অনেকাংশেই আশাব্যঞ্জক ও সুদূরপ্রসারী। প্রস্তাবিত এই বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৯,০০৯ কোটি টাকা (শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৬,৮৪৭ এবং প্রাথমকি ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২২,১৬২), যা মোট বাজেটের ১৪.৪ শতাংশ ও মোট দেশজ আয়ের ২.৪ শতাংশ এবং গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি।

বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিতকরণ, বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ১,১২৫টি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ৩৪,৮৯৫ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেছেন। এছাড়া National Human Resource Development Fund (NHRDF) এবং National Skills Development Authority (NSDA) গঠনের প্রস্তাব, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে একটি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ, জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রণয়ন এবং বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে যে সকল অর্জন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য ও তা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বাস্তবায়ন বিষয়ে অর্থমন্ত্রী একটি কথাও বলেননি, যদিও সরকার সবসময় এটিকেই তাদের অর্জনের তালিকায় প্রথম স্থান দিয়ে থাকেন।

যাই হোক, সাদা চোখে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ও বরাদ্দের জন্য প্রস্তাবনা চমকপ্রদ হলেও 'সবার জন্য গুণগত শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ অথবা সে লক্ষ্যে এগিয়ে চলায় পাথেয় হিসেবে প্রস্তাবিত এই বাজেট কতটুকু গ্রহণযোগ্য? প্রথমেই একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে যে, শুধুমাত্র ৮ম জাতীয় পে-স্কেলের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মরত শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বছরে অতিরিক্ত কত টাকা প্রয়োজন? এ বছরের মার্চ মাসে একটি পত্রিকায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত ৪৭৭,২২১ জন শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৮ম পে স্কেলের কারণে বছরে প্রয়োজন হবে প্রায় ৭,১৯৫

কোটি টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি শুধু বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত ৪৭৭,২২১ জন এমপিওভূক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৭,১৯৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষক ও অনান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য কত টাকা অতিরিক্তি লাগবে?

দ্বিতীয়ত, ২০০৯-উত্তর সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ করে ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। অনেকে এটিকে বিশ্বে রোল মডেল হিসেবেও উল্লেখ করে থাকেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের একটি পরিসংখ্যানে দেখাযায়, ২০০৫ সালে দেশে নেট ভর্তির হার ছিল ৮৭.২% যা ২০১৪ সাল শেষে ৯৭.৩% উন্নীত হয়েছে। একইভাবে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ৪৭.২% থেকে ২০.৯%-তে দাঁড়িয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় অর্জন। কিন্তু ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীর হার যেভাবে বেড়েছে, একইসাথে তার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ কি বেড়েছে?

অপরদিকে, ২০১২ সালে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭,৬৭২, সেখানে শিক্ষক ছিল ২১৪,৫৬৮ জন। ২০১৩ সালে সরকার নতুনভাবে ১০৪,০০০ জন শিক্ষকসহ ১২৬,১৯২টি বেরকারি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারি সুবিধার আওতায় নিয়ে আসেন। নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত এসকল বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় যথাক্রমে ৬৯% এবং ৪৮% বেশি। এসকল বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে। কিন্তু পরবর্তী বাজেটগুলোতে নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত এই বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো, শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বাস্তবতা হচ্ছে, নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত ১০৪,০০০ জন শিক্ষকের বেতন সরকার পর্যায়ক্রমে দিয়েছিল।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষকদের এই বেতন ও অন্যান্য খরচ অন্য কোনো উপখাত যেমন প্রশিক্ষণ, গবেষণা বা অন্য খাত থেকে নেওয়া হয়েছিল। ফলে, শিক্ষায় পরিমাণগত উন্নয়ন সাধিত হলেও বাস্তবে গুণগত মান ব্যাহত হয়েছে।

সরকারসহ মাঠ পর্যায়ে বাজেট ঘোষণার পর গত কয়েকদিনে যে কথাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে তা হলো, শিক্ষাখাতের বরাদ্দ গত বারের তুলনায় ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্যিই কি তাই? যদি বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী টাকার যে অবমূল্যায়নের কথা বলেছেন এবং নতুন পে-স্কেলের কারণে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তা বাদ দিলে প্রকত অর্থে কতটুকু বেড়েছে? আমি পরিসংখ্যান ভালো জানি না, কিন্তু যতটুকু যোগ-বিয়োগ বুঝি তাতে দেখছি এটি কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোনোক্রমেই ১০ শতাংশের বেশি বাড়েনি।

জাতীয় আয় ধরে বরাদ্দের হিসেব করলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ২.৪ শতাংশ, যা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। সার্ক ও আশিয়ানভুক্ত দেশগুলো যেমন ভারত (৩.৮%), ভিয়েতনাম (৬.৬%), মালেয়েশিয়া (৫.৯%), থাইল্যান্ড (৭.৬%), নেপাল (৪.৭%) প্রভৃতি দেশগুলো বাংলাদেশের তুলনায় শিক্ষাখাতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে থাকেন।

ডাকার ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৬% বা জাতীয় বাজেটের ২০% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনেও মোট জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৪-৬% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। উপর্যুক্ত ডকুমেন্টে সাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৪-৬% শিক্ষাখাতে বরাদ্দের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু আমরা এখনো লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অনেক পিছিয়ে।

এরপরও বিগত বছরগুলোর তুলনায় প্রস্তাবিত এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ আমাদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করলেও 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়নের বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় কোনো ধরনের উল্লেখ না থাকাটা আমাদের আশাহত করেছে। প্রস্তাবিত বরাদ্দ বর্তমান সময় ও প্রয়োজনের বিবেচনায় যথেষ্ট নয়। আশা করছি, আগামী অর্থবছরগুলোতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতের এই বরাদ্দ মোট জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশে উন্নীত হবে। একইসাথে বরাদ্দকৃত এই বাজেট স্বচ্ছতার সাথে যথাযথ ও কার্যকর ভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আর এসবের মাধ্যমে অর্জিত হবে সবার জন্য গুণগত শিক্ষা যা রূপকল্প ২০২১ অর্জনসহ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান

কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান

মো. ইয়াসিন আরাফাত ও মো. সাজ্জাদ হোসেন খান

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

গত দুই দশকে এই বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির সূচনা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতি নামে যতটুকু সৃজনশীল কাজে কি ততটুকু সৃজনী সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কি সক্ষম? প্রত্যাশা ছিল অনেক। প্রাপ্তির বিষয়টা প্রশ্নসাপেক্ষে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির সঙ্গে "Texonomy of Educational Objective" নামক একটি তত্ত্ব যুক্ত। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের

দশকে প্রখ্যাত মার্কিন শিক্ষামনোবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ব্লুম শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা কয়েকজন মিলে শিক্ষার মূল তিন ধরনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আলোকপাত করেন, বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিক ও মনোপেশিজ। এই ধরনগুলোকে তাঁরা ডোমেইন নামে অভিহিত করেন। যার আবার কতগুলো সাব-ডোমেইন বা উপক্ষেত্র আছে। যেমন: বুদ্ধিবৃত্তীয় ডোমেইনের ছয়টি সাব-ডোমেইন বা উপক্ষেত্র আছে, জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এগুলোর প্রথম তিনটিকে নিম্নতর শিখন যোগ্যতা এবং পরের তিনটিকে উচ্চতর শিখন যোগ্যতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন এই বুদ্ধিবৃত্তীয় ডোমেইনেরই একটি পরিমার্জিত রূপ।

২০১০ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বিদায় করে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার সূত্রপাত। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পঠিত বিষয়ের কতটা গভীরে যেতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন করা হয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের দুটি অংশ, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক। রচনামূলক অংশে একটি সৃজনশীল প্রশ্নে চারটি অংশ বা প্রশ্নাংশ থাকে।

প্রশ্নটি শুরু হয় একটি উদ্দীপকের মাধ্যমে। সৃজনশীল প্রশ্নের চারটি অংশের সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে এমন কোনো গল্প,

কবিতা, ছবি বা চার্ট উদ্দীপক হতে পারে। প্রশ্নের প্রথম অংশটি জ্ঞানমূলক, যা স্মৃতিনির্ভর। দ্বিতীয় অংশটির দ্বারা শিক্ষার্থীর পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়টি কতটা ভালোভাবে বুঝেছে তা যাচাই করা হয়। প্রশ্নের পরের প্রয়োগমূলক। অংশ দ্বারা পাঠ্যবিষয়কে শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনে বা বৃহৎ পরিসরে কাজে লাগাতে কতটুকু সক্ষম তা মূল্যায়ন করা হয়। শেষ অংশটি উচ্চতর শিখন যোগ্যতা হল। অর্থাৎ, এই অংশটি বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নের যেকোনো একটি উপক্ষেত্র থেকে হতে পারে। এই অংশের উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীকে বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে হয় এবং তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক যুক্তিসাপেক্ষে নিজস্ব মতামত তুলে ধরতে হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম দুটি অংশের উত্তর পাঠ্যবই থেকে প্রদান করা যায়, আর পরের দুটি অংশের জন্য উদ্দীপকের সহায়তা প্রয়োজন।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের উদ্দীপক তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উদ্দীপকটি যেনতেন হলেই হয় না। এটাকে অবশ্যই মৌলিক, অপ্রয়োজনীয় শব্দমুক্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ হতে হয়। দৈর্ঘ্যও পাঁচ থেকে ছয় লাইনের বেশি হওয়া উচিত নয়। উদ্দীপক শিক্ষার্থীদের কোনো নেতিবাচক ধারণা দেবে না। ক্ষেত্রবিশেষে নেতিবাচক বিষয়কে ইতিবাচকভাবে বা তার প্রভাব বা পরিণতি কী হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে উদ্দীপকটি উপস্থাপন করা যায়। যেমন: ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা বা নারী নির্যাতনের মত কোনো বিষয় নিয়ে লেখা উদ্দীপকে শাস্তির ব্যাপারটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করার জন্য আগে প্রশ্ন, তারপর উদ্দীপক লেখা যেতে পারে। প্রশ্নগুলো পূর্ব থেকে ঠিক করা না থাকলে উদ্দীপক লেখার কাজে নানারকম জটিলতা দেখা যায়। উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়া, ভিন্ন শিখনফলের তথ্য চলে আসা, অন্য অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর অযাচিত অন্তর্ভুক্তি, প্রশ্নের সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্কহীনতা, তথ্য পরিবেশনে অসামঞ্জস্য ইত্যাদি জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ফলে হিসেবে উদ্দীপকটি তার যথার্থতা হারাতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং উত্তর প্রদানে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে। প্রশ্নসংশ্লিষ্ট শিখনফল জানা থাকলে উদ্দীপক তৈরি অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রশ্নের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশটির উত্তর দেবার জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্দীপকের সাহায্য নিতে হয়। যদি উদ্দীপক না পড়েই এ দুটি অংশের উত্তর করা সম্ভব হয়, তাহলে বুঝতে হবে উদ্দীপকটি যথাযথ হয়নি বা প্রশ্নগুলো জ্ঞানমূলক হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা পরিমাপ করা অসম্ভব।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের অপর অংশটি নৈর্ব্যক্তিক। রচনামূলক অংশের মত এখানেও চারটি শিখন যোগ্যতার উপর প্রশ্ন করা হয়। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে সাধারণত ১৬টি জ্ঞানমূলক, ১২টি অনুধাবনমূলক, ৮টি প্রয়োগমূলক ও ৪টি উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নসহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকে। প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের শুরুতে একটি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য থাকে, যাকে স্টেম (stem) বলে। তবে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নগুলো উদ্দীপকের ভিত্তিতে করতে হয়। এই উদ্দীপকগুলো তৈরিতেও যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে তিন ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন করা হয়, সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের বিকল্পগুলোকে অপশন (option) বলে। অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তরকে কী (key) এবং অবশিষ্টগুলোকে বিক্ষেপক বা বিভ্রান্তক (distractor) বলে অভিহিত করা হয়। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হল, উপযুক্ত বিকল্প নির্বাচন করা। প্রতিটি বিকল্প নির্বাচন করতে হয় ঐ প্রশ্নের আলোকে এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের ভেতর থেকে। বিক্ষেপকগুলো এমন হওয়া প্রয়োজন, যেন প্রতিটি বিক্ষেপকই শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা রাখে। এ জন্য বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তরের কাছাকাছি হতে হবে। যারা পাঠ্যবই ভালভাবে বুঝে পড়বে তাদের পক্ষে বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক উত্তর নির্বাচন করা সহজ হবে।

ব্লুম মূলত শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি দিক-নির্দেশনা দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই মূল্যায়ন সংঘটিত হয়, তাই পরবর্তীকালে তাঁর এই তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ব্লুম জ্ঞানমূলক ডোমেইনকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন শিখন যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী। অর্থাৎ, প্রতিটি স্তর থেকে পরের স্তরে যেতে জানার পরিধি বেশি থাকতে হবে। উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট, অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে যা জানতে হবে, প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য তাকে আরও বেশি কিছু জানতে হবে। তার মানে, শিখন যোগ্যতায় উচ্চতর অবস্থানের কারণেই অনুধাবনমূলক প্রশ্নের চেয়ে প্রয়োগমূলক প্রশ্নে বেশি নম্বর থাকা উচিত, প্রশ্নের উত্তরের দৈর্ঘ্যের কারণে নয়। সে হিসেবে, উচ্চতর দক্ষতার কোনো প্রশ্নের উত্তর এক লাইনও হতে পারে, হয়তো তা লিখতে গেলে অনেক চিন্তার দরকার হবে এবং অনেক কিছু জানতে হবে। আর এই কারণেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়নেও সৃজনশীলের ধারণা প্রয়োগ করা যায় অতি সহজেই। তবে এটা সত্য, তিন বা চার নম্বরের একটি প্রশ্নের উত্তর কিছুটা দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে উত্তরপত্র মূল্যায়নে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তরের দৈর্ঘ্যই নম্বর প্রদানের মূল

প্রভাবক হিসেবে বিবেচিত। আর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই দর্শন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করছে চরমভাবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি এমন নয় যে, যে কেউ চাইলে এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি করে ফেলতে পারবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষকরা তা পেয়েছেনও। তবে এই ঘরানার শিক্ষকের সংখ্যা হাতেগোনা। আবার প্রশিক্ষণের সময়কালও ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। মাত্র ৪দিনের একটি প্রশিক্ষণ কীভাবে এমন জটিল বিষয়ে শিক্ষকের দক্ষ করে তুলতে পারে, তা বোধগম্য নয়। এর ফলও পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। এই পদ্ধতি সূচনার অর্ধদশক পেরিয়ে গেলেও, শিক্ষকদের মাঝে অনেক বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। তাই শিক্ষকরা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে সসম্মানে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। পরিবর্তে কতিপয় সংস্থা বা সমিতির নিকট থেকে ধার করা প্রশ্নপত্রে চলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা। এসব প্রশ্নপত্রে ভুলের পরিমাণও দৃষ্টি এড়ায় না। যে শিক্ষকরা কষ্ট করে তৈরি করেন, তাদের প্রশ্নপত্রও কাঙ্খিত মানে পৌঁছাতে পারছে না। অনেক শিক্ষকই সৃজনশীল প্রশ্নপত্র বলতে শুধু রচনামূলক অংশকেই বুঝে থাকেন, নৈর্ব্যক্তিক অংশও যে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের অংশ সেটা বোঝেন না।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা কমানো। মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা চিন্তাহীন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা যা গলাধঃকরণ করে, পরীক্ষার সময় তাই উগরে দেয়। কিন্তু এই অবস্থার কি আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়েছে? সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর পর থেকেই কী এক অজানা কারণে শিক্ষার্থীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিছুই যদি মুখস্থ না করে, তাহলে তারা পরীক্ষায় লিখবে কী? আগে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রশ্ন থাকতো, যার কয়েকখানার উত্তর মুখস্থ করে নিলেই চলতো। এখন কী হবে! কী প্রশ্ন আসবে, কীভাবে উত্তর লিখতে হবে - এসব নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। আর তাদের এই অবস্থা কাটানোর জন্য দয়াবান প্রকাশকেরা হাজারখানেক গাইড বই ছেড়ে দিয়েছেন বাজারে। আর শিক্ষার্থীরাও হামলে পড়েছে। মুখস্থ করার হিড়িক বেড়েছে বৈ কমেনি। ফলে পাঠ বুঝে পড়া এবং চিন্তা করে উত্তর প্রদানের ব্যাপারটি সকলের অগোচরেই চুলোয় গেছে।

শিক্ষার্থীদের গাইড-নির্ভরতার পেছনে আরেকটি অনুঘটক জোরালোভাবে দায়ী। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা না হয় বাদ দেয়া গেল। কিন্তু পাবলিক পরীক্ষায়ও যদি গাইড বই থেকে প্রশ্ন হুবহু কমন পড়ে যায়, তাহলে শিক্ষার্থীদের কি ঐ গাইড অনুসরণ করা উচিত নয়? সৃজনশীল প্রশ্নের প্রকৃতি হল, প্রতিটি প্রশ্নই হবে মৌলিক। কোনো প্রশ্নের সঙ্গে অন্য কোনো সালের কোনো প্রশ্নের সঙ্গে আক্ষরিক, আংশিক বা প্রেক্ষাপটগত মিল থাকবে না। অর্থাৎ প্রতিটি প্রশ্নই হবে নতুন। আমাদের কর্তা ব্যক্তিদের সময়ের অভাব কিংবা সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে অদক্ষতা গাইড বইয়ের বাজারকে রমরমা করে তুলেছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে

শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের এক-দশমাংশ প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে নিলেই কেল্লাফতে। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার এটাও বড় একটা যুক্তি ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এখন আর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই না পড়লেও চলবে, গাইডবইয়েই সব পাওয়া যায়। নতুন পদ্ধতি, তাই সব গাইডবইও নতুন করে বের হয়েছে। শিক্ষার্থীরাও অত্যধিক উৎসাহে গিলে যাচ্ছে। দু'পক্ষই খুশি। তবে ক্ষতিটা হচ্ছে জাতির। গাইড প্রকাশকদের পকেট ফুলেফেঁপে উঠছে ঠিকই, কিন্তু বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মস্তিষ্ক চিন্তন ক্ষমতা হারাচ্ছে। একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যা অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অভিভাবক তার সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন স্বাভাবিক। কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পর থেকে অন্য সবার মত অভিভাবক মহলের উৎকণ্ঠাও বেড়ে গেলো কয়েকগুণ। মূল কারণ একটাই - সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে না জানা কিংবা যথেষ্ট সচেতনতা না থাকা। এতে করে সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে তারা সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারছেন না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ধারণাও অপ্রতুল থাকায় অভিভাবকের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। আর এই সুযোগে কোচিং ব্যবসাও জমে গেল। কোচিং ব্যবসা আগেও ছিল, এখন শুধু ফরম্যাটে একটু পরিবর্তন এসেছে।

"সম্পূর্ণ সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়ানো হয়" স্লোগানে কোচিং-এর শতশত বিজ্ঞাপন হামেশাই চোখে পড়ে রাস্তায়। উপায়ন্তর না দেখে অভিভাবক সন্তানকে কোচিং-এ পাঠাচ্ছেন। অতি উৎসাহী ব্যবসায়ীরা এখন গ্রামেও কোচিং ব্যবসা বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল, তারা আবার শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসের পর ব্যাচে পড়াচ্ছেন। অনেকে ব্যাচে পড়তে বাধ্য করছেন। ঢাকার স্বনামখ্যাত অনেক বিদ্যালয়েই এই প্রবণতা প্রকট।

একটি শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়নই কেবল সৃজনশীল হলে চলে না, শিখন-শেখানো কার্যাবলিকেও সৃজনশীল হতে হয়। কেননা এই শিখন-শেখানো কার্যাবলিই শিক্ষার্থীকে প্রত্যাশিত শিখন যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে, আর তা প্রতিফলিত হয় মূল্যায়নে। বাংলাদেশে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন-শেখানো

কার্যাবলি এখনো গতানুগতিক। উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসু মনকে জাগিয়ে তুলতে হয়, সমস্যা সমাধানের প্রবণতা গড়ে তুলতে হয় এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের উপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হয়। শিখন-শেখানো কার্যাবলি যদি এই ব্যপারগুলোর অনুগামী না হয়, তাহলে শিক্ষার্থী সৃজনশীল পদ্ধতির মত একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে প্রত্যাশিত সমতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হবে - এটা অনুমিত। বিকল্প হিসেবে শিক্ষার্থী গাইড বইকেই বেছে নেবে। ২০১২ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রমে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি ডোমেইন বা শিখন স্তর থেকে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফল অর্জনের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলি কী হবে এবং কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, তা স্পষ্টভাবে বলা আছে। তার মানে হল, যদি শিক্ষক শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ করেন, তাহলেই তার কাজ প্রায় পুরোটা হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, শিক্ষাক্রম অনুসরণ করাতো পরের ব্যাপার, বেশির ভাগ বিদ্যালয়েই শিক্ষাক্রম জিনিসটির হদিসই কেউ জানেন না।

শিক্ষাক্রমে আর একটি ব্যাপার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে, তা হলো গাঠনিক মূল্যায়ন। এই পদ্ধতির মূল্যায়নের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। শিক্ষার্থী সত্যিকার অর্থে কতটুকু শিখতে পেরেছে সেটাই দেখা হয়। এ কারণেই গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অতি সহজে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যালয় শিক্ষায় গাঠনিক মূল্যায়ন অনুপস্থিত। শহরের কিছু বিদ্যালয়ে ক্লাস টেস্ট নেয়া হয় বটে, তবে তা সামষ্টিক মূল্যায়নেরই নামান্তর। কেননা সেই মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থী সত্যিকার অর্থে কতটুকু শিখতে পেরেছে তা যাচাই করা হয় না, বরং কে কার চেয়ে বেশি নম্বর পেলো সেটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য যদি কেউ যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে সে হয়তো পরীক্ষায় কম নম্বর পাবে, কিন্তু শেখাটা হবে অনেক বেশি। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামুখী (সামষ্টিক মূল্যায়ন) হওয়ায়, এখানে শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষার্থী পরীক্ষার নম্বরই দেখা হয়, তা সে মুখস্থ করে অর্জন করুক কিংবা বুঝে। আর তাই যে পদ্ধতিতেই পরীক্ষা হোক না কেন, শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। মুখস্থ ছাড়া উচ্চ নম্বর নিশ্চিত করার বিকল্প তাদের সামনে থাকে না। সামষ্টিক মূল্যায়ন যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, যদি গাঠনিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা যেত, শিক্ষার্থীর শিখনও নিশ্চিত করা যেতো।

বাংলাদেশে এমন অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়, যা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয় না। সৃজনশীল পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি চালুর পূর্বে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়া অত্যাবশ্যক ছিল। কার্যকর বিস্তরণ ও পরিচিতিমূলক কার্যাবলী হাতে নিলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিকট সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল বার্তা পৌঁছাত না। মুখস্থনির্ভরতা কমানো, গাইড বইয়ের নিয়ন্ত্রণ, কোচিংকে নিরুৎসাহিত করা এবং সর্বোপরি চিন্তাশীল প্রজন্ম সৃষ্টিই ছিল সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এর কোনোটিই প্রত্যাশিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি। কোচিং ব্যবসা এবং গাইড বই নিয়ন্ত্রণে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। পাশাপাশি অভিভাবকদের কাছেও এ বার্তা পৌঁছানো যে, সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভয়ের কোনো ব্যপারই নেই, কেবল পাঠ্য বিষয়টুকু বুঝে পড়লেই চলবে।

সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার কথা ছিল শিক্ষার্থীদের, আর পথে বসার কথা ছিল গাইড বই প্রকাশক আর কোচিং ব্যবসায়ীদের। বস্তুত, ঘটেছে তার ঠিক উল্টো। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশির ভাগ পদক্ষেপেরই মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী যাতে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট দক্ষতা ও সমতা অর্জন করতে পারে। সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্যও ভিন্ন কিছু নয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি মানসম্পন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তাশীল এবং সৃষ্টিক্ষম। বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় হয়ে উঠতে পারে অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেজন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলোকেও উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মো. সাজ্জাদ হোসেন খান

প্রভাষক (শিক্ষা), সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

মো. ইয়াসিন আরাফাত

অফিসার, শিক্ষা সেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ

মোঃ মাহমুদ হাসান রাসেল

জীবনের দাবী: সর্বক্ষেত্রে স্থিতিশীল সহায়ক পরিবেশ ও সবুজ পৃথিবী

বাংলা গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল এবং হাজার নদীর দেশ। পৃথিবীর দুই প্রধান নদী পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র সেই দুর্গম তিব্বতের মালভূমি থেকে জলধারা বয়ে এনেছে এই বাংলায় এবং এই বাংলার বুক দিয়ে হাজারো স্রোত উপস্রোতের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে সেই জল ঢেলে দিচ্ছে এবং এই জল, মাটি, বায়ু এগুলোর মধ্যে যে একত্ব, জীবনের যে সমগ্রতা সেটাকে বিনষ্ট করলে আমরা জীবনকেই নষ্ট করে ফেলি। আধুনিক জীবনযাত্রার নানা অভিঘাত আর আমাদের অদূরদর্শিতা, উন্নয়নের নামে অন্ধ প্রতিযোগিতা, উন্নয়ন ধারণার ঘাটতি ইত্যাদির

দ্বারা আমরা আমাদের বাংলার পরিবেশকে দূষিত করে চলেছি। আমরা যদি বাংলার নদীধারার দিকে তাকাই তবে দেখতে পারি এই নদী আমাদের জীবনকে নানাভাবে গড়ে দিচ্ছে।

আমাদের বাউল কবি, লোক কবিগণ নানাভাবে নদীকে নিয়ে নানা বন্দনা যেমন করেছেন তেমনি নদীর ভাঙনকে যে একুল ভাঙে ওকূল গড়ে, কিংবা এই যে বলে, এই দেখিলাম সোনার ছবি, এই দেখি নাইরে' জীবনের এই নিত্যতা নদীর প্রবাহ বা প্রকৃতি বা ঋতুচক্র যেভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটাই জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। এদেশের সম্পদ হচ্ছে তার জল, মাটি ও মানুষ। ফলে আমরা যখন হাজার বছরের বাংলাদেশ বলি, তখন হাজার বছরের ভূগোল এবং ইতিহাসকে স্মরণ করি।

আমাদেরকে বাংলার মাটির প্রতি আনত হতে হবে, বাংলার জলকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। জলধারায় আমরা যেমন স্নাত হবো, জলধারাকে অবলম্বন করে জীবন বিকশিতও করবো।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের চারপাশে আছে গৃহ-পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দুর্যোগ-দুর্বিপাক, রাজনৈতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, আকাশ-পাতাল, ঘটন-অঘটন, বায়ু, জল-স্থল, পাখ-পাখালি, বন-জঙ্গল, মানুষ, পশু, গাছপালা, দিগ্বিদিক, আলো-আঁধার, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দেশ-বিদেশ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক, কল-কারখানা, যান-বাহন, রাস্তাঘাট, কৃষি, শিল্প, আহার-ভোজন, লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অনুসন্ধান-গবেষণা,

সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই পরিবেশেরই উপাদান।

আর গোটা পরিবেশের একটি কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রতিবেশ ব্যবস্থা। প্রতিবেশ হলো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যমান প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মিলিত রূপ। পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেই মানুষসহ সকল জীবন টিকে আছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই প্রকৃতি যুগিয়ে আসছে আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। প্রতিটি প্রতিবেশ ব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হলো মানুষ। মানুষের সাথে একই ভূখন্ড, একই বনভূমি, একই জলাভূমি সমভাবে ব্যবহার করার কথা অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মানুষের অত্যধিক চাহিদার কারণে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সংকট তৈরী হচ্ছে। প্রতিবেশ ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে।

সেই সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ুগত পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব যা পরিবেশের শৃঙ্খলায় ব্যঘাত ঘটাচ্ছে। এর ফলে অনেক প্রাণীর স্বাভাবিক আচরণ, স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস, স্বাভাবিক যৌনতা প্রভৃতিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এমন পরিবর্তন চলমান থাকলে মানুষের অস্তিত্বও একসময় বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়ে যাবে। যা নতুন নতুন প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, মরুময়তা, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের ফলন হ্রাস, বায়ুমন্ডলে ক্ষতিকর গ্যাস ও অবাঞ্ছিত বস্তুকণার পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি মানুষের অস্তিত্বের উপর আজ সরাসরিই আঘাত হানছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো। অন্য দিকে এর জন্য বহুলাংশে দায়ী হচ্ছে উন্নত ও ভোগবাদী দেশসমূহ। পরিবেশ-প্রতিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ ও অপরিমেয় ভোগবাদিতা গরিব দেশগুলোর জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষজনকে আরও বেশি কঠোর অবস্থার মুখোমুখি করছে। উন্নত বিশ্বের কার্যকলাপের মূল্য তারা দিচ্ছেন কখনও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করে, কখনও খাদ্যঘাটতিতে ভুগে, কখনও শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সারে ভুগে আবার কখনওবা বাস্তুহারা হয়ে। পাশাপাশি পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মেরু অঞ্চলে যে হারে বরফ গলছে তা থামানো না গেলে অচিরেই দক্ষিণ এশিয়ার অনেক নিচু অঞ্চলসহ পৃথিবীর আরও অনেক নিচু অঞ্চলের ঠাঁই হবে পানির নিচে। পৃথিবীতে দিন দিন সুপেয় পানির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং সেই সাথে বাড়ছে জমির অম্লত্ব ও লবণাক্ততা। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি আমরা নিজেরাও এর জন্য দায়ী। সামান্য কিছু আর্থিক লাভের আশায় আমরা বনের পর বন কেটে সাফ করে ফেলছি, নির্বিচারে পাহাড় কাটছি, নদী-নালা-খাল-বিল কোন কিছুকেই স্বাভাবিক থাকতে দিচ্ছি না, কল-কারখানার দূষিত বর্জ্য ঠিকভাবে পরিশোধন না করেই প্রকৃতিতে ঢেলে দিচ্ছি।

সর্বসাকুল্যে আমাদের নদীর সংখ্যা প্রায় ২৩০ টি। এর মধ্যে বেশিরভাগ নদীই হারিয়েছে তাদের নাব্যতা। নদী দূষণ ধারণ করেছে আগ্রাসী রূপ। সেই সাথে নদীর পানি প্রবাহ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার আটশ কিলোমিটারে। নদীভাঙন এখন একটি নিয়মিত ঘটনা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে আর্দ্রতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ২০৩০ সালে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০ থেকে ১৫ শতাংশ এবং ২০৭৫ সালে তা প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়ে যাবে। ফলে বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা বেড়ে যাবে চরম হারে। জলবায়ু পরিবর্তনের এসবের প্রভাব ইতিমধ্যে বিভিন্নভাবে লক্ষণীয়। উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় বনায়নের গাছ মারা যাওয়ার ঘটনা এরই প্রভাব। অধিক হারে গাছ নিধন, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন - এসব কারণে বায়ুমন্ডল ও ভূপৃষ্ঠসহ সর্বত্র বিষিয়ে উঠছে। পরিবেশকে বাঁচাতে হলে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

বুড়িগঙ্গার করুণ পরিণতি আমাদের সকেলরই জানা। বুড়িগঙ্গার পানির দূষণ এত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের কোন দেশের প্রচলিত প্রযুক্তি দিয়েই এই নদীর পানি পরিশোধন সম্ভব নয়। অনুসন্ধানে জানা যায়,শুধু বুড়িগঙ্গা নয়, ঢাকার চারপাশের সব নদীরই দূষণ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নদী রায় নিয়জিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) দূষণ কমাতে নিয়মিত কাজ করছে বলে দাবী করলেও নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ হয়নি। ঢাকা ওয়াসার হিসেবে, রাজধানীর ৭০ শতাংশ এলাকার পয়োবর্জ্যই সরাসরি যাচ্ছে বুড়িগঙ্গাসহ চার নদ-নদীতে। পরিবেশ অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী বুড়িগঙ্গার পার ও নিকটবর্তী প্রায় দুই হাজার, শীতলক্ষ্যার সাড়ে ৭০০ এবং তুরাগ ও বালু নদের আশপাশের এলাকার ছয় শতাধিক কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি যাচ্ছে এসব নদীতে। ছাই, রাসায়নিক পদার্থ ফেলে নদীকে দূষিত করছে বুড়িগঙ্গা পাড়ের ডকইয়ার্ডগুলোও। তবে পাঠক আপনাদের জন্য আনন্দের খবর হলো এ বছর বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক হাজার ১২৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের' অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নিউ ধলেশ্বরী, পুংলী, বাংশাই, তুরাগ নদী পুনঃখনন করা হবে যাতে বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকা

মহানগরীর চারপাশে বহমান নদীগুলোতে পানি প্রবাহ বজায় থাকে।

সুন্দরবনের প্রধানতম ঐতিহ্য হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, চিতা বাঘ, বিভিন্ন ধরনের পাখি, সাপ, গুইসাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া গাছ, মৌচাক, বিভিন্ন দেশী প্রজাতির সুস্বাদু মাছ ইত্যাদি। বর্তমান চিত্র হলো, এগুলোর সবই ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক বন্যপ্রাণী কালের আবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর অনেকগুলো বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে 'টেকসই উন্নয়ন' কথাটি বহুল আলোচিত ও পরিচিত একটি বিষয়। ১৯৬০ সাল থেকে উন্নয়ন ধারণায় পরিবেশ ও প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ উন্নয়নের সাথে আরেকটি বিষয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে আলোচিত হয়, তা হচ্ছে নারীর উন্নয়ন। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন, উৎপাদনের ধরণ, ভোগ এবং বন্টনের সাথে নারীর সরাসরি ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং পরিবেশগত উন্নয়নের সাথে জেন্ডার বৈষম্য এবং অসমতার বিষয়টিও প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার সর্বনিম্নে এবং শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে তারা সর্বাধিক বৈষম্যের শিকার। ফলে সমভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ না থাকায় এবং নারীর অংশগ্রহণকে যথাযথ মূল্যায়ন না করায় ব্যাহত হচ্ছে পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

ইতিহাসের এই পাতাটি আমাদের সকলেরই কমবেশী জানা। একটা সময় ছিল যখন মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করতো। প্রকৃতিকে নিজ প্রয়োজনমতো ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের ছিল না। মানুষ যখন যাযাবর জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক জীবনে প্রবেশ করে তখন থেকেই নারী, প্রকৃতি ও পরিবেশ উভয়ই পুরুষের কর্তৃত্বে চলে আসে। অথচ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আদিমকাল থেকেই তুলনামূলকভাবে নারীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। নারীর মাধ্যমেই সূচিত হয় কৃষি সভ্যতা। কৃষি সম্পর্কিত স্থানীয় ঐতিহ্য ও জ্ঞানের বাহন হচ্ছে গ্রামীণ নারী সমাজ। বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াও দেশীয় পদ্ধতিতে বহুমুখী ফসল উৎপাদন, ফসল তোলার পর তার মাড়াই, গোলাজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ-অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর রয়েছে অসামান্য অবদান।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের কারণেও পুরুষের তুলনায় নারী প্রকৃতির অনেক বেশি কাছাকাছি থাকে। খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন, গৃহস্থালী কাজ, সন্তানের পরিচর্যা, পশুপালন, জ্বালানি আহরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক জীবন ধারায় নারীর ভূমিকাই বেশি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের নারীরা জীবনধারণের জন্য পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

মানুষ ইকোসিস্টেম বা প্রকৃতি রাজ্যের রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে যাতে প্রকৃতি রাজ্যের ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে প্রকৃতির যে অবনতি ঘটছে তাতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য। কারণ মানুষ প্রকৃতির উর্দ্ধে নয়, প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ।

জীব জগতে যখন প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়, তখন তারা এমন সব কাজ করে যা তার চারপাশের জগৎকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেয় না। যেমন একটি দেশের মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে চলে তারা তখন নানা রকম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। বাড়তি মানুষের জন্য বাড়তি খাবারের দরকার পড়ে। তাই তারা উচ্চফলনশীল ফসলের চাষে আগ্রহী হয়। এর কারণে ব্যবহার বাড়ে সার, বীজ, কীটনাশক আরো কত কী। চাষের জমি বাড়াতে, চাহিদা অনুযায়ী বাড়ি তৈরিতে কাটতে হয় বন। এতে হুমকির সম্মুখীন হয় বন্যপ্রাণী। বায়ুমন্ডলে বেড়ে যায় কার্বন, ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওজন স্তর। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা যায় বেড়ে। বাড়তি মানুষের চাহিদা কেবল খাদ্যে সীমিত নয়, তাদের জন্য পণ্যসামগ্রীর সরবরাহও বাড়াতে হয়। ফলে গড়ে ওঠে নতুন নতুন কলকারখানা, ইঞ্জিনচালিত নানা প্রকার যানবাহন। এসব কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য আর যানবাহনের কালো ধোঁয়া দূষিত করে পরিবেশ। কলকারখানার ধোঁয়া যেমন বায়ুদুষণ ঘটাচ্ছে, তেমনি কলকারখানার পরিত্যক্ত তরল রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে বিষাক্ত করছে। এছাড়া রেফ্রিজারেটার ও এয়ারকন্ডিশনারজাত ক্লোরো ফ্লোরো কার্বণ (সিএফসি) গ্যাস বাতাসের ওপরকার ওজোন বলয়কে ছিদ্র করে সূর্যের আলোর অসহনীয় উত্তাপকে সরাসরি পৃথিবীতে ফেলতে সাহায্য করে জলবায়ুকে উত্তপ্ত করছে। এভাবেই চলমান রয়েছে মৃত্তিকাদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ।

কৃষিতে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা যেমন স্থায়ীভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে তেমনি ধ্বংস করা হচ্ছে হাজারও উপকারী কীট-পতঙ্গ, দূষিত করা হচ্ছে পানি। ফলে মরে যাচ্ছে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী । বর্তমানে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে। জমিতে কীটনাশক দেয়ার ফলে খাদ্য বিষাক্ত হয়ে যায়। খাবার গ্রহণের পর এই বিষগুলো মানুষের শরীরে জমা হয়। এসব বিষের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের শরীরে চর্মরোগ, ক্যান্সার, শারীরিক দুর্বলতাসহ পাকস্থলী, নাড়ী

ও স্নায়ুর নানা রোগ দেখা দেয়। জমিতে কীটনাশক ছিটানোর সময় তা সরাসরি বাতাসে মিশে যায়। শ্বাস নেয়ার সময় এই বিষ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এর ফলে বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথাসহ শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। অনেক সময় বিষে আক্রান্ত হয়ে কৃষক মারা যায়।

স্বাস্থ্যরক্ষায় ভেষজ ওষুধ প্রচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঔষধি গাছ এখন দুস্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ায় ওষুধ সংগ্রহের জন্য মানুষ এখন বাজারমুখি হয়ে পড়ছে। ফলে হাজার বছর ধরে অর্জিত মানুষের এই লোকজজ্ঞান ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্প বিকাশের পরবর্তী পর্যায় থেকে ফসল উৎপাদনে প্যাকেটজাত বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে। প্যাকেটজাত বীজ থেকে উৎপাদিত ফসল বীজ উপযোগী হয়না। তাই প্রতিবার ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের নির্দিষ্ট কোম্পানীগুলো থেকে বীজ ক্রয় করতে হচ্ছে। ফলে বীজ বাণিজ্যে কোম্পানীগুলো প্রচুর মুনাফা করছে।

৫ জুন পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭২ সালে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি)' গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। সময়ের হিসেবে এবারে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ৪২তম বার্ষিকী।

গত বছরের ৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সম্মেলন কোপ-২১ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশসহ মোট ১৯৫ টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। মজার বিষয় হলো, ১৯৯৫ সাল থেকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো অভিযোগ করে আসছিলো যে, দ্রুত শিল্পায়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার, সর্বস্তরে আধুনিকায়ন ও নগরায়নের ফলে এর কুফল হিসেবেই জল-স্থল-অন্তরীক্ষ দূষিত হয়ে একদিকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হয়ে ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে পড়ছে জলবায়ু ও পরিবেশ, আর সেজন্য যে উন্নত ও শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোই দায়ী, কিন্তু তারা তা কোন অবস্থাতেই তারা মানতে চাচ্ছিলনা এতদিন। কিন্তু এখন এর ক্ষতিকর প্রভাবে পড়ে তারাই আবার কম-বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে দেখে, এখন তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালেই অনুষ্ঠিত কোপ-২১ সম্মেলনে ১৯৫টি দেশই একমত হয়ে দীর্ঘদিনে আলোচনায় থাকা কার্বন নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে বৈশ্যিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সে.-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য একটি আইনগত বাধবাধকতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে কতিপয় সুপারিশ

- পরিবেশ-প্রতিবেশ বিষয়ক ব্যপক জনপ্রচারণা চলমান রাখা;
- শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ-প্রতিবেশকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা;
- পরিবেশ রক্ষায় অধিকতর কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি কলকারখানায় পরিশোধন যন্ত্র(ইটিপি) স্থাপন করা;
- বিআইডব্লিউটিএ-এর উদ্যোগে নদীর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমানোর প্রচেষ্টা চলমান রাখা;
- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশবাদী সংগঠন গড়ে তোলা;
- পর্যাপ্ত গাছ রোপণ ও নদী দখল রোধ ;
- জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ভূ-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে উদ্ভিদ ভূগোলতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বাস্তসংস্থানবিদ্যা, জলবায়ুতত্ত্ব, দূর্যোগ মোকাবিলা, নগর পরিকল্পনা, সমুদ্রতত্ত্ব, গ্রামীণ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- অভয়ারণ্য সৃষ্টি করে, পরিবেশ প্রমোদ ভ্রমণ বা ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা;
- সমুদ্র উপকূলে বেড়িবাঁধ ও বেড়িবাঁধের দুপাশে বৃক্ষরোপণ করা;
- প্রাকৃতিক বনভূমিতে বৃক্ষনিধন রোধ করা;
- যেকোন লোকালয় বা জনবসতি পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা;
- বিভিন্ন নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা;
- লোকজ জ্ঞানের সাথে সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো;

সর্বোপরি পরিবেশকে ভালবাসতে হবে, পরিবেশের হৃদস্পন্দন অনুভব করতে হবে, পরিবেশের গভীর ক্ষতকে নিজের ক্ষত হিসেবে ভাবতে শিখতে হবে। তবেই আমরা পাবো সর্বক্ষেত্রে স্থীতিশীল সহায়ক পরিবেশ ও একটি বাসযোগ্য সবুজ পৃথিবী।

মো: মাহমুদ হাসান রাসেল
উন্নয়ন গবেষক ও জাতীয় সমন্বয়কারী
গণশিক্ষা আন্দোলন ফোরাম

তৌফিক আহমেদ

সুকুমার চিত্ত বিকাশে লোক-সংস্কৃতি ও গণনাটক

ক্রমবিকাশমান সভ্যতার সুতোয় গাঁথা উপাদানের আদিতে আছে আদি সংস্কৃতির চর্চা। মানুষের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান-জ্ঞান থেকেই সৃজনশীলতার প্রকাশ। সৃষ্টিশীল মানুষ লালিত উৎকর্ষকে সৌন্দর্য বোধে সাজিয়েছে শত রূপে শত বার। সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনাচার থেকেই জন্ম নেয় শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। মানুষের মৌলিক চাহিদার সাথে একাত্ম হয় আত্মার শান্তি তথা চিত্ত বিনোদন। পর্যায়ক্রমে মানুষ নিত্য নতুন বিনোদন মাধ্যম সৃষ্টি করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চিত্রকলা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি ললিত কলার উদ্ভব ঘটে। সামগ্রিক কলার সমন্বয়ে রূপ নেয় নাট্যকলার। যে কলার মাধ্যমে মানুষ একই সাথে একটি সমন্বিত রস আস্বাদন করতে পারে। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় নাটক ও নাট্যকলা তথা থিয়েটার সীমাবদ্ধতার গন্ডি পেরিয়ে যায়। নাটকের অবয়বে আসে বহুমাত্রিকতা। নাটকের শ্রেণী বিন্যাসে অভ্যুদয় ঘটে গণনাটকের।

সংস্কৃতি যে কোন সমাজ উন্নয়নকে তরান্বিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। কেননা মানুষ লোকসংস্কৃতিকে মনের গভীরে লালন করে। কোন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনাচার থেকেই গড়ে ওঠে মূলত তাদের সাংস্কৃতিক কাঠামো। তাই বলা হয়, এটি একটি অবিরাম প্রক্রিয়া।

পল্লী সঙ্গীত ও লোক নাট্য

আমরা যদি সংস্কৃতির আদিগন্ত বিচার করি তবে এর বিশাল অংশ জুড়েই দেখতে পাব লোকজ সুর ও সঙ্গীতের বিস্তৃত রূপ যা থিয়েটারের শেকড়ে প্রথিত।

আমাদের দেশে এক সময় অসংখ্য রকমের গান ছিল। যে গানগুলো ছিল একান্ত আমাদের মাটির গান। এসব গান বিভিন্ন সুরের, বিভিন্ন রাগের, নানা বিষয় ও ভাবের। তবে এখনও বিলুপ্তপ্রায় কিছু লোকজ গান মাটি আকড়ে পড়ে আছে অবহেলা -অনাদরে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কণ্ঠে। এর মধ্যে, পালা, জারি, সারি, মুর্শিদি, মারফতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, কীর্তন, ভাব, বিচ্ছেদি, গম্ভীরা ইত্যাদি। কিন্তু কালের বিবর্তন আর অতিমাত্রায় সামাজিক আধুনিকায়নের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে এসব গান আর সুরের মূর্ছনা । অথচ এক সময় এসব গানের মাধ্যমেই মানুষ আরাধনা করত স্রষ্টার, খুঁজে ফিরতো আত্মার পরম সত্বাকে। প্রশান্তির সাগরে অবগাহন করতো সুরের সুললিত অমিয় ধারায়। গানের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে। আর তাই গান আর সুরের সাধনা বলে কিংবদন্তি হয়েছেন এ দেশের অসংখ্য আধ্যাত্মিক মরমী শিল্পী, সাধক, কবি। এসব বরেণ্য সাধকদের মধ্যে ফকির লালন শাহ, হাসন রাজা, গগন হরকরা, রাধারমন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ফকির আফতাব উদ্দিন, বিজয় সরকার, কানাইলাল শীল, রমেশ শীল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্তসহ অগণিত শিল্পী-কবি ও বাংলার দুই দিকপাল বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এরা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে মঙ্গল আলোয় উদ্ভাসিত করে চলেছেন। এদের গানে একদিকে আছে চিত্ত প্রনোদনা অন্যদিকে শিক্ষা ও সচেতনতা। মূলত লোক সংগীতের একটি বিশেষ ধারা থেকেই লোকনাট্যের উদ্ভব।

সঙ্গীত এমনি এক শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষকে একই সাথে কোন একটা বিষয়ে জানতে, বুঝতে ও চিন্তা করতে সাহায্য করে এবং সচেতনতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। এ কথা

অনস্বীকার্য যে দেখা, শোনা, এবং শিখনের অনেকটাই চর্চার অভাবে মানুষ একটা পর্যায়ে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু একটি গান দীর্ঘকাল মানুষের মনের গভীরে অনুরণিত হতে থাকে। এমনকি কোন কোন গান মানুষ সারাজীবনেও ভোলে না। এখানেই সঙ্গীতের বিশেষত্ব। আমরা জানি, কথা, সুর আর বাদ্যযন্ত্রের সঠিক সমন্বয়ে একটি সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তাই সুর ও সঙ্গীতের বহুমাত্রিক ব্যবহার সর্বত্র- সর্বজনবিদিত; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কাছে। উপাসনালয় থেকে যুদ্ধের ময়দান; পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের গভীর পর্যন্ত যেন সঙ্গীত বিস্তৃত। প্রাকৃতিক নিসর্গেও সুরের ঐন্দ্রজালিক আবহ ছড়িয়ে আছে। প্রেমে, বিদ্রোহে- বিপ্লবে, আনন্দ-বেদনায় সুর আর সঙ্গীত যেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

একটা সময় ছিল যখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত নাট্যচর্চা হত। বছরে কমপক্ষে দুই একটি নাটক মঞ্চায়ন হত। এই নাটক মঞ্চায়নকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে মহড়া চলতো। সারা প্রতিষ্ঠান জুড়ে একটা উৎসবের আমেজ বিরাজ করতো। শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর থাকতো শিক্ষাঙ্গন। অভিভাবকসহ আশপাশের নাট্যামোদী ব্যক্তিবর্গের সাথে একটা মেলবন্ধন তৈরি হত। কালের পরিক্রমায় আজ তা বিস্মৃত। সেই সব চর্চা থেকেই বেরিয়ে আসতো প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকর্মী আর দেশবরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব। একই ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাতেও ছিল শিল্পমনা শিক্ষার্থীদের বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ। তার পর তারাই আবার নিজ নিজ এলাকায়, পাড়া মহল্লায় আয়োজন করতো নাটক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের।

শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষ্টি আর বিনোদনের মৌলিক উপাদান এর সমন্বয়ে গঠিত আমাদের সংস্কৃতি। কোন একক নির্দিষ্ট বিষয় বা উপাদানকে আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি না। প্রতিটা বিষয় মূলত সংস্কৃতির এক একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকসংস্কৃতির একটি বিশাল অঙ্গ হচ্ছে গীত-বাদ্য তথা সঙ্গীত। বিশেষ করে গাননির্ভর লোকজ শিল্প ও সাহিত্য মাধ্যমগুলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও গতিশীল করনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ঐক্য তৈরি করতে পারে। সর্বোপরি সচেতনতার ভিত্তিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য শক্তি যোগাতে পারে।

এখন নাটক সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এখন নাটক শুধু বিনোদন মাত্র নয়। তাই বিশেষভাবে নির্মিত নাটককে উন্নয়ন থিয়েটারও বলা হয়। নাটক চাহিদা সৃষ্টি আর দাবি আদায়ের শৈল্পিক ভাষা। নাটকের রয়েছে এক নান্দনিক শক্তি যা নির্মল বিনোদনের পাশাপাশি ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে দাঁড় করাতে পারে অশুভ শক্তির বিপরীতে। বলা হয়ে থাকে নাটক ইতিহাসের স্বচ্ছ দর্পণ। এর মাধ্যমে মানুষ পরিবর্তন ঘটাতে পারে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও বৈরিতার। সুস্থ জীবন বোধে উজ্জীবিত করতে পারে দেশ ও জাতিকে। যুগে যুগে যেখানেই অশুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে সেখানেই জন্ম নিয়েছে সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত তরুণ নাট্যকর্মী।

মূলত গণনাটকের ধারণা থেকে এবং নাটককে জনগণের উন্নয়নে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সত্তর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থাগুলো 'পপুলার থিয়েটার' কার্যক্রম হাতে নেয়। সেসময় বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এইভাবে, "যে শিল্পের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যে শিল্প জনগণের জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্টি, যার আঙ্গিক হবে স্থানীয়, কিন্তু বিষয়বস্তু হবে সার্বজনীন তাই হবে পপুলার থিয়েটার।" পরবর্তীতে 'পপুলার থিয়েটার' এর ধারণাটি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে নতুনভাবে 'থিয়েটার ফর ডেভেলপমেন্ট' বা উন্নয়ন থিয়েটার নামে আখ্যায়িত হয়। সংক্ষেপে TFD বলা হয়।

গণমানুষের মাধ্যমে, গণমানুষের জন্য, গণমানুষের সামনে উপস্থাপিত, তাদেরই প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার আলোকে তৈরি নাটকই মূলত গণনাটক। কাজেই এ জাতীয় নাটকের দ্বারা-বিনোদনের মাধ্যমে সহজে বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়। সকল স্তরের দর্শকদের বোধগম্যতার সুযোগ থাকে। দর্শক এবং শিল্পীদের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগ ঘটে। দর্শক এবং শিল্পীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। জনগণের একতা বোধ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

যেহেতু নাটক একটি বিশেষ ধরণের শিল্প মাধ্যম, দৃশ্যকাব্য বা পারফর্মিং আর্টের অন্যতম শাখা তাই যে কোন স্থবির জনগোষ্ঠীকে নাড়া দেবার জন্য নাটকের প্রভাব আকাশচুম্বি। বিশেষ করে গণনাটক তথা উন্নয়ন থিয়েটারের ভূমিকা অপরিসীম। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে এই নাটক ম্যাজিকের মত কাজ করে। পিছিয়ে পড়া কোন জনপদে বসবসকারী মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ ও দৈনন্দিন সমস্যাবলী যখন নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হয় তাদের সামনে তখন তারা দেখতে পায় নাটক তাদের জীবনেরই সত্যের প্রতিফলন। নাটক হয়ে ওঠে কখনও উন্নয়নের দিক নির্দেশনা। অনিয়ম, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের দৃপ্ত শপথে মানুষ উজ্জীবিত হয়, চিন্তা-চেতনায় আসে ইতিবাচক পরিবর্তন। নানা প্রেক্ষাপটে থিয়েটারের শক্তিকে মানুষ কোন ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করেছে এমনকি অধুনা যে কোন ধরণের প্রশিক্ষণে অন্যতম প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে নাটিকা, নাট্যাংশ, ভূমিকাভিনয় ব্যবহার করা হচ্ছে যা Role play method নামে বহুল পরিচিত। এ ছাড়া ইলেক্ট্রনিক অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমেও নাটক, তথ্যনাট্য (ডকুড্রামা) প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব পদ্ধতি ও উপকরণ অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে আকর্ষণীয় ও শিখন বান্ধব।

তৌফিক আহমেদ

কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

মোস্তফা মল্লিক

শিক্ষায় দরিদ্র নয় বাংলাদেশ

যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন তারা জানেন, ইএফএ বা ডাকার ঘোষণা অথবা ইউএন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ বা এমডিজিস এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ ও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে সফলভাবেই নানান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছে।

বাংলাদেশে ২০১০ সালে প্রণয়ন হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি।

প্রাথমিকে ভর্তি-হার

সরকারিভাবে ৯৯% বলা হলেও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলো বলছে ৯৭.৩%। সরকারের পরিসংখ্যান গ্রহণ না করলেও ৯৭.৩% সত্যিই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই ঘটনা। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার তিন বছর আগে অর্জিত হয়েছে এমডিজি'র বেশ কয়েকটি দিক। এর মধ্যে অন্যতম ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষায় সমতা অর্জন। ৯৬.২ শতাংশ ছেলে শিক্ষার্থী স্কুলে যায়। আর মেয়েদের যাওয়ার হার ৯৮.৪ শতাংশ।

২০১৫ সালেই শেষ হয়ে গেছে সবার জন্য শিক্ষা এবং এমডিজিস-এর সময়সীমা। ওই বছরের মে মাসে কোরিয়ার ইনচনে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন। বাংলাদেশ যে কতোটা এগিয়েছে সেটা বোঝা গেছে সেই সম্মেলনে যেসব আলোচনা হয়ে সেখান থেকেই। ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় নানা টার্গেট দেওয়া হয় ইনচন সম্মেলনে। ১৪০টি দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা অবাক হয়ে গেছেন যখন তারা জেনেছেন বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, শিশু শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা চার কোটি। যা অনেক দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শুধু বেশিই নয় দ্বিগুণ। এত শিশুকে বই দিয়ে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে, অর্থনৈতিক ভাবে ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা তেল বেচে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাওয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো ধনী না হলেও শিক্ষায় এদেশ ওইসব দেশের চেয়ে অনেক ধনী। মান নিয়ে বির্তক আছে, থাকবে, কিন্তু বই বিতরণের এই অর্জনকে 'শিক্ষায় মান'-এর দোহাই দিয়ে যারা ছোট করতে চান তারা আসলে ভালকে ভাল বলতে একদমই রাজি নয়। ভিন্নদের কথাও ভিন্ন।

বিশ্বে নানা ধরনের দিবস পালিত হয় বছর জুড়েই। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিবস ঘোষণা করে। সে দিবসটি হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস। ২০১০ সাল থেকে ১ জানুয়ারি দিবসটি পালিত হয়ে আসছে উৎসবের মধ্য দিয়ে।

২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি শুক্রবার হলেও নির্দিষ্ট দিনেই জাতীয় অনুষ্ঠান করেছে মন্ত্রণালয়। বছরের প্রথম দিন দেশের সব প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, এবতেদায়ী, মাধ্যমিক স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৭২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে সরকার। ২০১০ থেকে ২০১৬ এই ৭ বছরের পরিসংখ্যান যদি তুলে ধরি, তাহলে দাঁড়ায় এই সময়ে বছরের প্রথম দিন সরকার ২৬ কোটি ২ লক্ষ ২১ হাজার ৮৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮৯ কোটি ২১ লক্ষ ১৮

হাজার ৮৯৫টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে পৌঁছে দিয়ে সারা বিশ্বেই এক অনন্য রেকর্ড করেছে। সরকারিভাবে এতো বই ছাপিয়ে বাঁধাই করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিনে বিতরণের নজির বিশ্বের কোথাও নেই। এতোগুলো বই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছাপা, বাঁধাই, পৌঁছে দেওয়া এবং সব শেষে বিতরণ সত্যিই চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাদের ন্যূনতম যোগাযোগ নেই তাদের পক্ষে এটা বোঝা সত্যিই অসম্ভব।

যদি ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের কথাই ধরি এবং নানা খুঁটিনাটি বিষয় বলি, তাহলে অবাক হতেই হবে। এবার বই ছাপতে কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে ৮৫ হাজার ৮০৯ মেট্রিক টন। পরিবহণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সাড়ে ১৬ হাজার ট্রাক। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮৬টি। বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল ছিল ২১ হাজার। আর পরিবহণে কর্মী নিয়োজিত ছিল ৯৯ হাজার।

প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়েছে ৬৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫৪টি। প্রাথমিকের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৩টি বিষয়ের, এবতেদায়ী ৩৬ বিষয়ের, মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের জন্য ১১৪টি বিষয়ের, এসএসসি ভোকেশনালের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৮টি বিষয়ের এবং দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালের শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৮টি বিষয়ের বই বিতরণ করা হয়।

এখানেই কার্যক্রম শেষ নয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ওয়েবসাইটে ই-বুক ফর্মে দেয়া আছে। www.nctb.gov.bd/ www.ebook.gov.bd এই ঠিকানা থেকে যে কোন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গবেষকরা বই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরাও পেয়েছে তাদের বই। এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে এমডিজি'র বেশ কয়েকটি বিষয়ে বাংলাদেশের যে অর্জন তা কি করে সম্ভব হয়েছে? শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা বলছেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে, বিশেষ করে বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে যাওয়াতে শিক্ষার প্রতি সবার আগ্রহ বেড়েছে। শিক্ষায় আগ্রহ বেড়েছে বলেই নারীদের শিক্ষায় আসার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কমেছে বাল্যবিবাহ। পুষ্টি বৃদ্ধি ও মাতৃমৃত্যুর হার কমার পেছনেও কাজ করেছে শিক্ষা।

শিক্ষায় এতো বিনিয়োগের পরেও অবশ্য একটি কথা বলতে হচ্ছে যে, শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ কিন্তু বিগত কয়েক বছরে তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল (নতুন বাজেটে যদিওবা তা অল্প পরিমান বৃদ্ধি করা হয়েছে)। ইনচন ঘোষণায় কিন্তু বাংলাদেশের এই ব্যর্থতার কথা তুলেও ধরা হয়েছে। ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ডাকার ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৬% বা জাতীয় বাজেটের ২০% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি কোনো সরকার। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এমনকি নেপালও এদিক দিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। যদি সত্যিই বাংলাদেশ ওই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতো, তাহলে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানো হয়তো এখনই সম্ভব।

মোস্তফা মল্লিক
সিনিয়র করসপন্ডেন্ট
চ্যানেল আই

প্যানেলভুক্তরা নিয়োগ পাবেন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্যানেলভুক্ত প্রার্থীরা সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন ২০১৩ সালে জাতীয়করণ (সরকারি) করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বর্তমানে সারা দেশে এ ধরনের প্যানেলভুক্ত শিক্ষক আছেন প্রায় ২৮ হাজার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এবং সচিব হুমায়ুন খালিদ *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর আশা করছেন দু-একদিনের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়ে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রায় ২৬ হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে সরকার। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, ওই সব বিদ্যালয়ে যত শূন্য পদ আছে, এতে প্যানেলভুক্ত সবাইকে নিয়োগ দেয়া যাবে।

২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২০১২ সালে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ৪২ হাজার ৬১১ জনকে নিয়োগের জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হয়। এঁদের মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার জনকে নিয়োগ দেয় সরকার। সবাইকে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিলেও ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হলে প্যানেল থেকে নিয়োগ বন্ধ করা হয়। এতে নিয়োগবঞ্চিত ও প্যানেলভুক্ত শফিকুল ইসলামসহ নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ১০ জন হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ওই রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে গত বছরের ১৮ জুন রায়ে হাইকোর্ট রিট আবেদনকারী ১০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যরা আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) করলে তা খারিজ করেন আপিল বিভাগ। এরপর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় ঐ ১০ জনকে নিয়োগের ব্যবস্থা করলে সাতজন যোগ দেন। এবিষয়ে আরও তিন শতাধিক রিট হয়। এখন পর্যন্ত ঘোষিত সব রায় প্যানেলভুক্তদের পক্ষে গেছে। পরে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে সবাইকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রথম আলো ০১.০৬.২০১৬

শিক্ষার মানে এখনো ঘাটতি আছে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষায় সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মানও বাড়ছে। তবে এখনো মানের ঘাটতি আছে। এটা তাঁরা অস্বীকার করবেন না।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোই এখন তাঁর বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে নতুন নিয়মে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিগগিরই নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে হিন্দুধর্ম বিষয়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ১ হাজার ১৪১ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। পরে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা সবাই পাস করেছে। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৯ জন। ওই ঘটনার পর একজন পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। দায়ী কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

প্রথম আলো ০২.০৬.২০১৬

শিক্ষায় বরাদ্দ বেড়েছে

নতুন বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট ৪৯ হাজার ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিগত সময়ের হিসেবে সামগ্রিক শিক্ষা খাতে এটাই সর্বোচ্চ বরাদ্দ। শিক্ষায় এ বরাদ্দ আগের বছরের বাজেটের চেয়ে ১১ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বেশি। আগের অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ৩৭ হাজার ১১১ কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতের কার্যক্রমে রয়েছে, ভিশন-২০২১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও এমডিজিতে শিক্ষা খাতের জন্য উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ এবং পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্যকরণের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগনের নাগালে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া রয়েছে নতুন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এমপিওভুক্তকরণ, টেকসই মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী তিন হাজার স্কুল নির্মাণ, ঢাকা মহানগরীতে নতুন করে সরকারি ১১টি মাধ্যমিক ও ছয়টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন, ৩১৫টি নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় রূপান্তর, জেলা পর্যায়ের ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানও এখানে উল্লেখ্য। অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে চলতি অর্থবছরেও বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণসহ নানা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে কারিকুলাম প্রণয়ন, বই মুদ্রণ ও শিক্ষক নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৮৯৫ শিক্ষক। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫ হাজার ১৭টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের ফলে বিদ্যালয়/শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ৩৮ লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই ছাত্রী। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এরই মধ্যে ৭ হাজার ৫০০ তে উন্নীত হয়েছে।

আলোকিত বাংলাদেশ ০৩.০৬.২০১৬

মানব সৃষ্ট কারণেই পরিবেশ বিপর্যয়

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) উদ্যোগে প্রতিবছর সারা বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'বন্য প্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ।' বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। পরিবেশবাদীদের মতে, বাংলাদেশের প্রকৃতির অন্যতম উপাদান বন ও বন্যপ্রাণী। বিভিন্ন অঞ্চলের বন ও বন্যপ্রাণী মিলে গড়ে উঠেছে নানা ধরণের প্রতিবেশ অবস্থা। গড়ে উঠেছে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ। প্রকৃতিতে এদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে প্রতিনিয়ত বন ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। বন ধ্বংস, অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার, দারিদ্র, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প কারখানার দূষণে বাংলাদেশের পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। বনভূমি উজাড়ের পাশাপাশি হারিয়ে যাচ্ছে বন্যপ্রাণী। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর দাবদাহে যতটা পরিবেশের ক্ষতি হয় তার চেয়ে শতগুণ বেশি হয় মানব সৃষ্ট কারণে।

পানি দূষণ: দেশের নদী দূষণের কারণ শিল্প-কারখানার বর্জ্য। দেশের বড় ও মাঝারি ধরণের প্রায় ৮ হাজার

শিল্প-কারখানা মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল প্রভৃতি এলাকার শিল্প-কারখানাগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকর বর্জ্য পার্শ্ববর্তী নদীগুলোতে নিঃসরণ করছে। এসব এলাকার খাল-বিল-নদী মারাত্মক দূষণের শিকার। ভরাট হয়ে যাচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী পুকুরও।

বায়ু দূষণ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী বায়ুদূষণের দিক দিয়েও বাংলাদেশের বাজধানী ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। দূষণ নির্ণয়ের ইনডিকেটর হিসেবে বাতাসে ভাসমান অতি সুক্ষ্ম বস্তু কণা পিএম ২.৫ নিয়মিত পরিমাপ করা হয়। অ্যামোনিয়া, কার্বন নাইট্রেট ও সালফেটের ক্ষুদ্রকণা সমন্বয়ে গঠিত পিএম ২.৫। বাতাসে এ পিএম ২.৫ এর পরিমাণ উচ্চমাত্রায় থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর ক্ষতিকর প্রভাবে ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, উচ্চ রক্তচাপ, অবসাদ, ফুসফুসে প্রদাহ ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

আমাদের সময়, ০৫.০৬ ২০১৬

বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে

যে দেশে শিক্ষায় যত বেশি প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, সে দেশ তত বেশি টেকসই উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে বি এ, এম এ পাসের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও মাঠপর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের দক্ষ লোক নেই। একইভাবে ডাক্তার থাকলেও দক্ষ নার্স নেই। তাই দেশে এখন থেকেই মাধ্যমিকে বৃত্তিমূলক এবং উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দিতে হবে। গতকাল রবিবার ইনিস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) আয়োজিত 'জাতীয় টেকসই উন্নয়ন ও অপচয় রোধে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অর্থবছর নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন।

আইডিইবি সভাপতি এ কে এম এ হামিদের সভাপতিত্বে বৈঠকে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার মহাপরিচালক মো. আব্দুল মতিন, স্থপতি এহসানুল হক খান, ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ, মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব, ড. সৈয়দ আব্দুল আজিজ প্রমুখ। ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন খরচই খরচ নয়। এটা বিনিয়োগ। আমাদের দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন একটা ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে, যাতে অনেক দিকেই নজর দিতে হয়। তারপরও বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে অনেক এগোচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা বেসরকারি খাতের অবদান আছে। এগুলো হিসাব করলে শিক্ষা খাতের বাজেট অনেক বড় হবে। তবে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের বাজেট তুলনা করা হয় সেসব দেশে বেসরকারি শিক্ষা নেই বললেই চলে। তাই তাদের বরাদ্দ বেশি মনে হয়।'

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সরকারি পলিটেকনিকে এবার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫৭ হাজার করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় আমরা একটা বড় ধাক্কা দিতে চলেছি। কারিগরি ক্ষেত্রে যত কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে, কেউ তাতে না করছে না। এভাবে চলতে থাকলে ২০২০ সালের আগেই এই খাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ শতাংশ উন্নীত হবে।'

বনিক বার্তা ০৬.০৬.২০১৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিরা সভাপতি হতে পারবেন না

সংসদ সদস্যরা (এমপি) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের (গভর্নিং বডি) সভাপতি থাকতে পারবেন না এবং বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেননি আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি আবেদন করলে রোববার শুনানি শেষে কোনো আদেশ দেননি (নো অর্ডার) প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চ। বেঞ্চের অপর তিন সদস্য হলেন বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার। রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন ড.ইউনুস আলী আকন্দ।

আদেশের পর আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ সাংবাদিকদের বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রবিধানমালা ৫ ও ৫০ ধারা বাতিল ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগের আদেশে বহাল রয়েছে। সুতরাং সংসদ সদস্যরা গভর্নিং বডির সভাপতি থাকতে পারছেন না। এর আগে ১৩ এপ্রিল একটি রিটের শুনানি শেষে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালন এবং নির্বাচন ছাড়া কমিটি গঠনকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রিটে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রবিধানমালা ২০০৯-এর ৫ ও ৫০ ধারা হচ্ছে বিশেষ কমিটি গঠনের বিষয়ে। শুনানি শেষে গাইকোর্ট এ দুটি ধারা বাতিল করেন বলে রিটকারী আইনজীবী ইউনুস আলী জানান।

আলোকিত বাংলাদেশ ১৩.০৬.২০১৬

মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রসারিত করার কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত করার কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। বাস্তবতা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সুবিধা বিবেচনা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখেই আপাতত প্রাথমিক স্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হবে। বুধবার জাতীয় সংসদে টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ইলিয়াছের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কোচিং বাণিজ্য বিষয়ে মন্ত্রী জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে কোচিং নীতিমালা-২০১২ বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকগণদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরকারি দলের এ কে এম রহমতুল্লাহের প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দেশের সরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের হার হচ্ছে - ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৮ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য ১০ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর জন্য ১২ টাকা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর (কলা ও বাণিজ্য) জন্য ১৬ টাকা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর (বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য, অর্থনীতি, সঙ্গীত) জন্য বেতন হচ্ছে ১৮ টাকা। নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। ছাত্র-সংসদ নির্বাচন বিষয়ে বেগম হাজেরা খাতুনের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে যেমন ছাত্র সংসদ কার্যকর ছিল তেমনি বর্তমানেও কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ রয়েছে। গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতির ধারা বজায় রাখার জন্য দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনকণ্ঠ ১৬.০৬.২০১৬

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ জনতার সংলাপ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা-এর যৌথ উদ্যোগে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গত ৩১ মে ২০১৬ ১টি জনতার সংলাপ ভোলা জেলার শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মু. নাজমুল হক। তিনি তার উপস্থাপনায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

শিক্ষার্থীর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা, একীভূত শিক্ষা, সরকারের বিভিন্ন পলিসি ও প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন মহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সুপারেন্টেডেন্ট, জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, ভোলা চিলড্রেন স্পেশাল স্কুল বাংলাদেশের পরিচালক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমূখ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় প্রতিনিধি জানান, ভোলা জেলায় একীভূত শিক্ষার আওতায় ৩৯০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যায়নরত আছে এবং দিনে দিনে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার শাখার উপ-পরিচালক মনোয়ার হোসেন বলেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমাজের সকল মানুষ মতই একসাথে উঠাবসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয় সরকারের পাশাপাশি সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে হতে হবে।

উক্ত সংলাপটিতে শিক্ষার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ একীভূত বাধার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি এ সকল বাধা দূর করার বিষয়ে কিছু সুপারিশ করেন।

সুপারিশমালাঃ

- এই সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দুই দিনের প্রশিক্ষণের পাশপাশি শিক্ষকদের এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দরকার, এছাড়া এ বিষয়ে ছাত্র-অভিভাবকদেরও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- এই সকল শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা, সহায়ক উপকরণ, উপবৃত্তি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা, পুষ্টি নিশ্চিতে স্কুলফিডিং কর্মসূচি প্রয়োজন।
- এছাড়া বিশেষ শিক্ষা বিষয়ক অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ দেওয়া দরকার।
- ভোলার বিদ্যালয়গুলো সাইক্লোন সেন্টার কাম বিদ্যালয় এবং এখানে সাধারণত দোতলায় ক্লাশ হয়। বিদ্যালয়গুলোতে র‍্যাম আছে শুধু নিচতলা পর্যন্ত ওপরে ওঠার কোন র‍্যাম নেই তাই এ বিষয়ে প্রয়েজনীয় দিতে হবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর শিক্ষাবৃত্তি ও সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা বিষয়ে সবাইকে জানাতে আরও উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আওতায় আনা যথেষ্ট ব্যয়বহুল, তাই এ বিষয়ে সরকারকে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করা দরকার।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি আরও নমনীয় করা প্রয়োজন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার পথ সুগম করতে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

রেহানা বেগম

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)৪/ শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র অন্যান্য লক্ষ্যের পাশাপাশি শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য-চার অর্জন বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে অবহিতকরণের মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজের করণীয় বিষয়ে মতামত তুলে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত মে মাসে স্থানীয় পর্যায়ে ৫টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জুন মাসে আরো ৩টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান ০৫ জুন সহযোগী সংগঠন রাসিন'র সহযোগিতায় ফরিদপুরে, ১৪ জুন দর্পন-এর সহযোগিতায় কুমিল্লায় ও ১৮ জুন স্পীড ট্রাস্টে-এর সহযোগিতায় বরিশালে এই মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। ফরিদপুরে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর-এর অধ্যাপক নাজমুল হক এবং কুমিল্লা ও বরিশালে আয়োজিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিটি সভায় আয়োজিত জেলার প্রতিনিধিরা ছাড়াও পাশ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম কর্মী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সিভিল সোসাইটির প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

সান্ত্বনা আইয়ুব

স্থানীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬

গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' ও 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিবেশ শিক্ষা ও জনসচেতনতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অভিযান সহযোগী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে নানাবিধ কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। ২০১৬ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি, বাঁচায় দেশ।

এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান ১০টি জেলায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করে। নির্বাচিত সংগঠনগুলো হলো, কোস্ট ট্রাস্ট, ভোলা, পল্লী সাহিত্য সংস্থা, পঞ্চগড়, ইউএসকেএস, নীলফামারী, শার্প, সিরাজগঞ্জ, রাসিন, ফরিদপুর, আশার আলো সংস্থা, মাদারীপুর, পাসা, মানিকগঞ্জ, আপুস, জামালপুর, জাগো নারী প্রগতি সংস্থা, লালমনিরহাট, আইএসডিই, কক্সবাজার।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র‍্যালি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনাসভাসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার সরকারি- বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনগণ এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

শামীম আরা কলি

বাংলাদেশে ASPBAE এর সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

২০ জুন ২০১৬ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত ASPBAE-এর সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিক মর্যাদায় প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান এবং কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর ASPBAE বাংলাদেশ।

জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী ASPBAE-এর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে সবাইকে অবহিত করেন। কে এম. এনামুল হক ASPBAE এর 7th General Assembly-কে সামনে রেখে ২০১৩-২০১৬ উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমের একটি বিবরণ তুলে ধরেন।

আলোচনার এই পর্যায়ে ASPBAE-এর কার্যক্রমরে সঙ্গে সদস্য সংগঠনের কার্যক্রমের কোথায় মিল বা অমিল রয়েছে এবং কোন কেন জায়গায় কাজ করা উচিত প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে।

আলোচনার এক পর্যায়ে এসডিজিস-৪ (SDGs 4)-এর উপর একটি উপস্থাপনা করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এজেন্ডার ৪র্থ লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য একীভূত, সাম্যভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ প্রসার (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all)

যা এডুকেশন ২০৩০ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষ্য-৪ এর অধীনে ৭টি টার্গেট ও ৩টি Means of Implementation রয়েছে। উল্লেখিত বিষয়ের উপর মুক্ত আলোচনার পাশাপাশি 7th General Assembly সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

গত মিটিংয়ের ফলো-আপ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ২ জন ভোট প্রদানকারী, একজন নারী প্রতিনিধি হিসেবে রাশেদা কে. চৌধূরী এবং একজন পুরুষ প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ-এর নাম পুনরায় ঘোষণা করা হয়। প্রতি বছর অন্তর একবার সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হবে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তাছাড়া সদস্য সংগঠনসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভায় অভিযানসহ ৮টি সংগঠন থেকে মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শামছুন নাহার কলি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধন শীর্ষক প্রশিক্ষণ

দেশে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে সাক্ষরতা ও কারিগরি দক্ষতা দুটোই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় ইতোমধ্যে দেশের অনেক মানুষ সাক্ষর হলেও তাদের জীবনমান উন্নয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কেননা সাক্ষরতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো সাক্ষরতা দক্ষতার মাধ্যমে নিজের মেধা ও কর্মমতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তনসহ সমাজ ও দেশের পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারা।

উপরোক্ত যৌক্তিকতাকে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান সারক্ষতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ জুন থেকে ১৬ জুন ২০১৬ তারিখ সচেতন, রাজশাহী ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধন শীর্ষক** ওরিয়েন্টেশন।

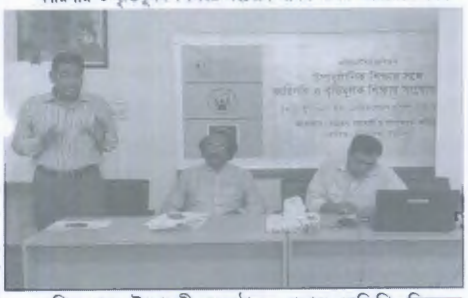

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব হাসিনুল ইকরাম, নির্বাহী পরিচালক, সচেতন, রাজশাহী। কোর্স আয়োজনে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মো: মহসিন আলম, সমন্বয়কারী, সচেতন, রাজশাহী। তৃণমূল পর্যায়ে সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শিক্ষক প্রতিনিধিসহ মোট ৩০ জন ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

মিজানুর রহমান আকন্দ

জাতীয় বাজেট ২০১৬-'১৭

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও আমাদের প্রত্যাশা

২০১৬-'১৭ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান এবং এর সকল সহযোগী সংগঠন ও শুভানুধ্যায়ীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানাই। প্রস্তাবিত এই বরাদ্দ 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিত করতে আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়নের বিষয়ে তেমন কোনো উল্লেখ না থাকায় আমরা কিছুটা আশাহত বোধ করছি।

এ প্রসঙ্গে ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনের প্রাক্কালে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

- সম্প্রতি বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)'- অনুযায়ী শিক্ষায় জাতীয় আয়ের ন্যূনতম ৪%-৬% বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় তা এখনি হয়তো সম্ভব নয়। **কিন্তু ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত এই ধারা (২.৪%) ধরে রেখে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১৮ সালে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর রূপরেখা/রোডম্যাপ প্রণয়ন;**
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী **শিক্ষাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং এর জন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;**
- ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ৮ম শ্রেণিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় **অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রদান;**
- মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের টয়লেট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ' শীর্ষক পরিপত্রের আলোকে **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান ও এর নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিতকরণ;**
- উচ্চশিক্ষায় বিশেষ করে চিকিৎসা শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষাসহ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ইতিবাচক ধারাকে ধরে রাখার জন্য **বাজেটে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবাসনসহ নারী শিক্ষার্থীবান্ধব প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান;**
- সম্প্রতি **দেশের মূল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছিটমহলগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন** এবং সেখানকার সকল শিশুর শিক্ষা, যুব ও বয়স্কদের সাক্ষরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান;
- বহু বছর ধরে (২০০৩ সাল থেকে) অপরিবর্তিত থাকা **শিক্ষা উপবৃত্তির মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ** বিশেষ করে ভৌগোলিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে এর **আওতা আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;**
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য **অটিস্টিক একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাবকে আমরা সাধুবাদ জানাই।** তবে এর পাশাপাশি 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩'-এর আলোকে অন্যান্য **সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য 'একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি' বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রয়োজন;**
- সকল নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে **প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান;**
- এখনো জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা বিদ্যালয়ের তুলনায় সংস্কারের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। তাই **পুরাতন বিদ্যালয় সংস্কার এবং প্রস্তাবিত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য অধিক বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;**
- দেশে বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য সামগ্রিকভাবে জীবনব্যাপী শিক্ষা কাঠামোর আওতায় **সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান;**
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের জন্য মানসম্মত গবেষণা অত্যন্ত জরুরি হলেও এবারের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তাই **গবেষণায়, বিশেষ করে সামাজিক উন্নয়নের সকল ধারায় উন্নত গবেষণার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অধিক বাজেট বরাদ্দ দেওয়া সময়ের দাবি।**

২০১৬-'১৭ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি, স্বচ্ছতার সাথে এ বাজেটের যথাযথ, সময়ানুগ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং বাংলাদেশকে অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার সোপান হিসেবে আগামী অর্থবছরগুলোতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রচার ও সমন্বয়ে :

গণসাক্ষরতা অভিযান
Campaign for Popular Education (CAMPE)
www.campebd.org; E-mail : info@campebd.org

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৬৫ আষাঢ় ১৪২৩ জুন ২০১৬

বিশ্ব পরিবেশ দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

আগামী দিনের পৃথিবীটা যেন শিশুর জন্য বাসযোগ্য হয়, এমন একটা প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাশার কথা বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর এবং বড়ই অকালে হারিয়ে যাওয়া সুকান্ত ভট্টাচার্য। তার আর এক অসাধারণ উক্তিও আমাদের করোটিতে আমৃত্যু গেঁথে থাকে-'চেরাপুঞ্জির থেকে আধখানা মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে'। কী অনন্য শব্দের ব্যঞ্জনা, কী অগাধ ব্যথা ও বঞ্চনার কথা, কী গভীর মানবিক চাওয়া ফুটে উঠেছে এই একটা পংক্তির মধ্যে। বড় বেদনায় আজ এইসব কথা মাথায় হুল ফোটাচ্ছে।

কেউ-ই একথার বিরোধিতা করতে পারবেন না যে, পৃথিবীটা দিন দিন অবাসযোগ্য হয়ে উঠছে। না, যখন এসব কথা বলছি, তখন শুধু ঢাকার সারি সারি বহুতল বস্তির কথা বলছি না, বুড়িগঙ্গার কেশ-কালো জলের কথা বলছি না, হাজারীবাগের ট্যানারীর বর্জ্যের সঙ্গে সহবাস করা মানুষদের কথা বলছি না। বলছি, সারা পৃথিবীর কথা। সারা পৃথিবীর সাধারণ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর মেরুর বরফ, হিমালয়ের বরফ গলে গলে পড়ছে। দুঃসহ গরমে প্যারিসে গত বছর কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের দেশে গত মাসে তিন দিন সময়ের ব্যাপ্তিতে ৫৯ জন বজ্রপাতে নিহত হয়েছে আর এ মাসের ২২ তারিখে ভারতে একদিনের বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা ৭৯। যদিও এখনও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, প্রকৃতি ঠিক কোন কারণে বিরূপ হয়ে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের বলিদান দাবি করছে, তবে একথা তো ঠিক, পরিবেশের অব্যাহত বিপর্যয়ের জন্য এত মানুষ বজ্রপাতে নিহত হচ্ছেন।

যতই বলি না, প্রকৃতি আমাদের প্রতি দিনের পর দিন সংহারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার করি না যে, আমরা প্রকৃতির সঙ্গে কী রকমের দানবসুলভ আচরণ করছি। প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই, এমন প্রবাদ অনাদি কালের। রবীন্দ্রনাথ যখন *মুক্তধারা* লিখেছিলেন, আধুনিকতার অনুসারী অনেকেই তার প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। কাহিনীটাকে শুধু গল্পের বলয়ের মধ্যে না রেখে যদি সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত করি, তা হলে এই মহান কবি-মনীষীর দূরদর্শিতার সীমানা অনুধাবন করতে পারব।

উন্নয়নের নামে, আয়েসী জীবনের খোঁজে, অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতির প্রতি আমরা যে অনাচার করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে, সেকথা আমরা প্রায়শই বিস্মৃত হই। স্বস্তির কথা যে, পৃথিবীর শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি, পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য যাদের দায় সিংহভাগ, তারা দেরিতে হলেও সম্ভাব্য বিনাশ ও ধ্বংস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদের ছবি
অশোক কর্মকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org